স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৩য় বর্ষ ❑ প্রথম সংখ্যা ❑ অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৩

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস, মনোজ দে

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা
প্রকাশক
ডা. জয়ন্ত কুমার দাস
স্বাস্থ্যের বৃত্ত-এর তরফে
ফ্ল্যাট : এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড
হাওড়া-৭১১১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয় ৩

চিঠিপত্র ৫৬

শরীর

বিকল্প চিকিৎসা না চিকিৎসার বিকল্প? (পর্ব-২) ❑ রাজা ভট্টাচার্য ৪
সুস্থ থাকার ব্যায়াম ❑ ডা. গৌতম মিস্ত্রি ৯
উচ্চ রক্তচাপ ❑ ডা. সূর্য্যেন্দুবিকাশ খাটুয়া ১৮
যক্ষ্মারোগকে জানা-বোঝা ❑ ডা. বিশ্বজিত চক্রবর্তী ২৪
নবজাতকের খাদ্য-খাবার ❑ ডা. স্বপন বিশ্বাস ২৭

মন

রূপান্তর বিকার ❑ ডা. সুমিত দাশ ২২

শরীর সমাজ

ওষুধের মূল্য-নিয়ন্ত্রণে কতটা লাভ হবে মানুষের? ❑ ডা. পুণ্যব্রত গুণ ১৪
এক গাঁয়ের ডাক্তারের গল্প ❑ ডা. অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত ৫২

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে | মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

আমার মায়ের কথা ❑ ডা. পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬
মেয়েরা ❑ সোমা মুখোপাধ্যায় ৪১
ভারতে মাতৃমৃত্যুর হার—একটি জাতীয় লজ্জা ❑ ডা. কাঞ্চন মুখার্জি ৪৩

চলচ্চিত্রে ডাক্তার

ডাক্তার যখন ডেমন, অথবা একটি নিছক ভূতের গল্প ❑ অংশুমান ভৌমিক ৩১

ডাক্তারের ডেস্ক

মেলাজমা ও সানস্ক্রিন ❑ ডা. জয়ন্ত দাস ৪৭

কুইজ ❑ অভিষেক দাস ৫১

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম ❑ বুকমার্ক ❑ পিপলস্ বুক সোসাইটি ❑ বই-চিত্র ❑ মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট ❑ অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ) ❑ এস. কে বুকস (উল্টোডাঙা)
শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল) ❑ ডা. শুভজিত ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়) ❑ মেডিকেল কলেজ এমার্জেন্সি গেটের বাইরের স্টল ❑ দুর্বার মহিলা সমন্বয়
কমিটি ❑ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ) ❑ বইকল্প, ঢাকুরিয়া ❑ পুষ্প নিউজ এজেন্সি, মালদহ ফোন : ৯৯৩২৯৬৭৯৯১ ❑ জাতিস্মর
ভারতী, জলপাইগুড়ি : ফোন : ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮ ❑ প্রয়াস মল্লভূম, লোকপুর, বাঁকুড়া : ৯৪৩৪২২৭৪৯৯ ❑ মাধব
পেপার স্টল, বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড : ৯৯৩২৪৫৫২৪৪ ❑ প্রদীপন গাঙ্গুলি, দার্জিলিং : ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২
শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বইয়ের স্টল

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭
পত্রিকা পাবার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন : ৯৮৩০৮৮৬৪৪১
ই-মেল : swasthyerbritte@gmail.com

‘স্বাস্থ্যের বৃত্তে’-র গ্রাহক হোন।

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬ টি সংখ্যার জন্য ১৫০ টাকা।

‘Swasthyer Britto’ এর নামে চেক বা ড্রাফ্ট
(বাইরের চেকের জন্য ৩০ টাকা যোগ করুন) পাঠান এই ঠিকানায় —
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর-৩, কলকাতা ৭০০০৯৭।

অথবা NEFT -র মাধ্যমে পাঠান এই একাউন্টে
Swasthyer Britto,
A/c No. 0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code : CNRB0000315

সম্পাদকীয়

ওষুধের ‘ন্যায্যমূল্য’ কী ও কেন

সরকার সম্প্রতি ৩৪৮ রকমের অত্যাবশ্যক ওষুধকে মূল্যনিয়ন্ত্রণের আওতায় এনে সেগুলোর সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেওয়ার কথা বলেছেন। যে দেশে মানুষ জীবনদায়ী ওষুধ কিনে খেতে পারেন না, সে দেশে এটা একটা শুভ উদ্যোগ বলেই মনে হয়। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখতে গেলেই সমস্যা। এত দিন অল্প কিছু ওষুধ মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় ছিল, সরকার ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেই সব ওষুধের উৎপাদন-খরচ, বাজারজাত করার খরচ এবং কোম্পানির কিছু লাভ—এই সব হিসেব করেই সেগুলোর সর্বোচ্চ দাম ঠিক করতেন। সেই দাম নিয়ন্ত্রণের আগের দামের চাইতে ঢের কম ছিল, আর তাতে ওষুধ কোম্পানিগুলো খুব আপত্তি করত। আর এবারে সরকার দাম ঠিক করার যে কৌশল ঠিক করেছেন, সেটাকে অদ্ভুত বললে কম বলা হয়। বাজারে একই ওষুধের বিভিন্ন কোম্পানির চালু ব্র্যান্ডগুলোর গড় দাম হবে সরকার-নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্য। এটাকে যে কী করে ‘সরকার-নির্ধারিত’ বলা হচ্ছে তা-ই বোঝা দায়, কেননা সরকার নানা কোম্পানি-নির্ধারিত দামের গড় করে সরকারি সিলমোহর দাগিয়ে দিচ্ছেন। কোম্পানিগুলো তাদের ব্র্যান্ডগুলোর দাম ঠিক করার সময়ে অতি-মুনাফা করে রেখেছে, সেই অতি-মুনাফা না থাকলে সরকারি মূল্য-নির্ধারণের কোনও দরকারই ছিল না। অতি-মুনাফার গড় করলে যে ‘ন্যায্যমূল্য’ হয় না, বা সে রকম ন্যায্যমূল্য দিয়ে যে আমজনতার ওষুধ-সমস্যার সুরাহা হয় না, অর্থনীতিতে পণ্ডিত না হয়েও আমরা সেটা বুঝি। সরকারি মন্ত্রী-সান্ত্রীরা কেন বোঝেন না, বলা শক্ত।

উচ্চতম স্তরে এই রকম নীতি-নির্ধারণ আর তার রূপায়ণের ফলে আমাদের দেশে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সমস্যা সর্বত্র। যেমন, গর্ভাবস্থা ও প্রসবজনিত কারণে মায়েদের মৃত্যু, বা মাতৃমৃত্যু। পৃথিবীর ১৮১-টা দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ১২৭ নম্বরে, আর ভারত জনসংখ্যায় পৃথিবীতে দ্বিতীয় হলেও মাতৃমৃত্যুর মোট সংখ্যায় বিশ্বে প্রথম। এ সব সমস্যার চটজলদি সমাধান নেই, কিন্তু আমাদের নীতি-নির্ধারকেরা যে সমস্যাটা সত্যিই বোঝেন, আর সেটা সমাধানের চেষ্টা করেন, সেটা এখনও জোর দিয়ে বলা শক্ত। এবারের ‘স্বাস্থ্যের বৃত্তে’র পাতায় আর সব লেখার সঙ্গে থাকছে ওষুধ মূল্য-নিয়ন্ত্রণ আর মাতৃমৃত্যু—এই দু’টো বিষয় নিয়ে আলোচনা।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত লেখা সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান, বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে লেখা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার ভিত্তিতে কোনও পাঠক নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করার চেষ্টা করবেন না। সে চেষ্টা করলে ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই সংশ্লিষ্ট পাঠকের, পত্রিকার নয়।

বিকল্প চিকিৎসা না চিকিৎসার বিকল্প?

চিকিৎসা কেবল মানবিকতা নয়, সেটা বিজ্ঞানও বটে; বর্তমান সময়ে চিকিৎসা হলো অনেকের ব্যবসা, আর অনেকের ক্ষমতার উৎসও। এই অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার নিরপেক্ষ তুলনা পাওয়া শক্ত— আপনাকেই বেছে নিতে হবে কোন ব্যবস্থা কাজের আর কোনটা অকেজো। এবার দ্বিতীয় পর্ব। — লিখছেন **রাজা ভট্টাচার্য।**

(প্রথম পর্বে আমরা দেখেছি, অ্যালোপ্যাথির মতো ভেষজ ওষুধেরও পার্শ্বক্রিয়া আছে, কিন্তু যেখানে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা ওষুধের পার্শ্বক্রিয়া ও ওষুধজনিত লাভ, এ-দু'য়ের বিচার করে ওষুধ প্রয়োগ করে ও রোগীকে চিকিৎসায় সম্ভাব্য লাভক্ষতির কথা জানিয়ে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয়, সেখানে ভেষজ ওষুধ তথা সমস্ত বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি পরীক্ষা না করেই 'পার্শ্বক্রিয়া নেই'—এটা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে।)

❖

হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদ দু'টোরই উৎপত্তিস্থল, মূলতত্ত্ব ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এরা একটা ব্যাপারে একজোট। দু'জনেই অ্যালোপ্যাথির বিরোধিতা করে—হয় সরাসরি, নয় একটু ঘুরিয়ে। এই 'একটু ঘুরিয়ে' ব্যাপারটা একটু বোঝা দরকার। দু'জনেই সমস্বরে বলে, আহা, আমরা তো বলছি অ্যালোপ্যাথি কাজে দেয়। আমরা বলছি, হ্যাঁ, অ্যালোপ্যাথি থাকুক, তার পাশাপাশি আমরাও থাকি। মানুষ যাকে পছন্দ তাকে বেছে নেবে। বেছে নেওয়ার অধিকার মানুষের এক মৌলিক অধিকার, তাই না? কিন্তু **ওই অ্যালোপ্যাথি-ওয়ালারা, ওঁরা কিন্তু সব কিছু একচেটিয়া করে নিতে চেষ্টা করছেন।** আমাদের দেশীয় (এইখানে হোমিওপ্যাথ আর আয়ুর্বেদ এ দু'য়ের দেশের সংজ্ঞা একটু বদলে যায় অবিশ্যি) চিকিৎসার বদলে ওঁরা বিলেত-আমেরিকা থেকে আমদানি-করা চিকিৎসাকে একমাত্র বলে চালাতে চান।

কথাটা একটু ভেবে দেখা যাক। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা বেশ ডেমোক্র্যাটিক ও দেশপ্রেমী, যদিও জার্মান দেশোদ্ভূত হোমিওপ্যাথির ওপর আসক্তি দেশপ্রেম বললে একটু অবাক লাগে, কিন্তু আমাদের দেশেই সবচেয়ে বেশি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আছেন বলে সেটাও খানিকটা এদেশের বস্তু বলে ভাবা হয়। তবু সে ভাবে দেখতে গেলেও ডেমোক্র্যাসিতে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা নির্ভর করে অবগত জ্ঞানের ওপর। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার মূলমন্ত্র হল, প্রতিটা চিকিৎসা পদ্ধতি ও ওষুধকে প্রমাণ দিতে হবে যে, সেটা কার্যকর। সেই পদ্ধতি মেনে যে ওষুধই আসুক না কেন, তাকে এই পরীক্ষায় উতরোতে হবে, তবে সেটা 'ওষুধ' তকমা পাবে। এ বাবদে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাতন্ত্রের কোনও বাছবিচার নেই, কোনও শুচিবায়ু নেই। শুধু তাই নয়, এই প্রমাণাদি 'Esoteric' বা গুপ্ত হলে চলবে না, পরীক্ষার ফলাফল সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। যদি কোনও 'আয়ুর্বেদিক' ওষুধ কী 'হোমিওপ্যাথিক' ওষুধ এই পরীক্ষায় উতরে যায়, তবে তা অ্যালোপ্যাথিতে ওষুধ হিসেবে মেনে নেওয়া হবে। উদাহরণ? কেন, প্রাচীন উদাহরণ তো আগেই দিয়েছি, উইলো গাছের ছাল তথা অ্যাসপিরিন। যদি উইলো গাছের ছাল সরাসরি তা থেকে বের করা অ্যাসপিরিনের মতোই নিরাপদ ও কার্যকর হতো ও তার পরিমাণ ও গুণের সহজ হিসেব করা যেত (যেমন ৫০০ মিগ্রা অ্যাসপিরিনের ক্ষেত্রে আমরা জানি ঠিক কতটা ব্যথা কমানো ও কতটা 'সাইড এফেক্ট' আমরা আশা করতে পারি), তা হলে অ্যাসপিরিনের বদলে গাছের ছাল সরাসরি ওষুধ বলে মেনে নিতে পদ্ধতিতন্ত্রের দিক থেকে অ্যালোপ্যাথির কিচ্ছু আপত্তি নেই। যেমন আফিং (থেকে মরফিন), সর্পগন্ধা (থেকে রেসারপিন নামক রক্তচাপ কমানোর ওষুধ)। এগুলো আয়ুর্বেদে ব্যবহার হতো বা হয়। যাঁরা ভেষজ ওষুধের 'পার্শ্বক্রিয়া নাই'- তে বিশ্বাসী, তাঁরা বেশ খানিকটা আফিম বা সর্পগন্ধার আয়ুর্বেদিক ওষুধ খেয়ে দেখতে পারেন, দ্রুত স্বয়ং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্বহস্তে চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ ঘটে যাবে। আর অ্যালোপ্যাথি প্রাকৃতিক পদার্থের গুণের কদর করে না? ভুল কথা। ভিটামিন বড়ি বা টনিক খাওয়ার প্রতি আমাদের অনেকের অবৈজ্ঞানিক আকর্ষণ আছে, জেনে রাখুন 'অ্যালোপাথি' মতে সাধারণ ভাবে ভিটামিন ওষুধ খাবার চাইতে সরাসরি খাদ্যে ভিটামিন খাওয়াই শ্রেয়। ভিটামিন সি-র বড়ি চোষার চাইতে ভাল লেবু খাওয়া, কিংবা খাওয়া আমলকী। কিন্তু যখন বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ পরিমাণ জিনিস চাই, তখন আধুনিক চিকিৎসা সেটাই দেবে - স্টেপ্টোকক্কাস সংক্রমণে নির্দিষ্ট মাত্রার পেনিসিলিনই দেবে, খামোকা 'পেনিসিলিয়াম নোটেটাম' ছত্রাক চিবিয়ে ইঞ্জেকশন করে অনিয়ন্ত্রিত মাত্রার পেনিসিলিন দিয়ে জীবাণুর সুবিধে করে দেবে না।

মুশকিল হল, **হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদ তাদের ওষুধের কার্যকারিতা ও পার্শ্বক্রিয়া নিয়ে কোনও রকম পরীক্ষায় বসতে রাজি নয়।** তবু কিছু হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদিক ওষুধ নিয়ে নানা বিজ্ঞানী পরীক্ষা করেছেন। যখনই কোনও পরীক্ষার প্রথম ধাপে এরকম ওষুধের কার্যকারিতার আভাস পাওয়া গেছে, তখন সেটার কথা 'বিকল্প ওষুধ'-এর প্রবক্তারা চারি দিকে প্রচার করেছেন; কিন্তু তারপরে যখন আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষায় সেটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে তখন সেই ফলাফল আর তাঁদের প্রচারতালিকায় স্থান পায়নি। এমন করে আর যাই হোক, সত্যানুসন্ধান হয় না। 'ডেমোক্র্যাসি' বা 'দেশপ্রেম'-ও হয় না। কেননা ডেমোক্র্যাসির প্রাথমিক শর্ত শুধু বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা নয়, তা হলে ভেজাল দেওয়ার অধিকারও 'ডেমোক্র্যাটিক', লোকে না হয় বেছে নেবে কোনটা ভেজাল আর কোনটা খাঁটি। 'দেশপ্রেম' তো এটা নয়ই, বহু দিন আগে ভারতে কিছু আবিষ্কার হয়েছিল বলেই সেটা এখনও শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান (আয়ুর্বেদ), বা বিপুল সংখ্যক ভারতীয় এটা প্র্যাক্টিস করছেন (হোমিওপ্যাথি) বলেই ভারতের জনগণকে সেই চিকিৎসায় কুরবানি যেতে হবে—এ রকম 'দেশপ্রেম' দেখানোর জায়গা চিকিৎসা ব্যবস্থা নয়।

প্রসঙ্গত, ভারতে আয়ুর্বেদ এক মহান অবদান। যখন রোগকে দেবতা বা অপদেবতার কীর্তি বলে ভাবা হত, রোগ সারানোর জন্য দেবতার কাছে হত্যে দেওয়া হত, তখন 'রোগের কারণ দেহের মধ্যেই আছে' এবং 'অতিপ্রাকৃতিক কিছুর শরণাপন্ন না হয়ে প্রাকৃতিক বস্তু দ্বারাই রোগের

চিকিৎসা করা যায়'— এইটা বলতে বেশ বুকের পাটা লাগে। আয়ুর্বেদ সেটা বলেছিল। সেই সময়ে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকেরাই ছিলেন সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞানমনস্ক, সবচেয়ে আধুনিক। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিতটা ভুললে চলবে না। সে দিনে 'বিজ্ঞান'-এর যতটা উন্নতি হয়েছিল, সেইটাকে আজ 'ঋষিবাক্য, সুতরাং চূড়ান্ত সত্য' বলে চালানোর চেষ্টা যাঁরা করেন, তাঁরা বিজ্ঞান-বিরোধী। বিজ্ঞান সতত গতিশীল, গতকালের 'সত্য' দিয়ে আজকের পথ আচ্ছন্ন করে রাখা তার চরিত্রধর্ম নয়।

হোমিওপ্যাথির তত্ত্ব ও ইতিহাস :

হোমিওপ্যাথি তেমন পুরনো শাস্ত্র নয়, এ-শাস্ত্রের জনক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান জন্মেছিলেন ১৭৫৫ সালে, মানে আমাদের পলাশীর যুদ্ধের দু'বছর আগে, আর হোমিওপ্যাথি শব্দটা তিনি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ১৮০৭ সালে। সে'সময়ের পাশ্চাত্যে চিকিৎসা-ব্যবস্থা বেশ খারাপ ছিল। স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র পাঠকদের মনে আছে বোধহয়, ১৭৯৯ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জার চিকিৎসা করতে গিয়ে ডাক্তারেরা প্রচুর রক্তমোক্ষণ করেন, আর তার ফলে ওয়াশিংটন মারা যান। এটা কিন্তু কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সে সময়ে প্রায় সব রোগেই রক্তমোক্ষণ করা হত, আর তার ফল ভাল হত না; কিন্তু কোনও চিকিৎসা-প্রণালীকে মূল্যায়ন করার সঠিক পদ্ধতি ডাক্তারদের জানা ছিল না। তাই শুধু রক্তমোক্ষণ নয়, আরও অনেক ক্ষতিকর ব্যবস্থা ও ওষুধ তখন চালু ছিল। সেই রকম একটা সময়ে হ্যানিম্যান বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারি পাশ করলেন, কিন্তু মাত্র বছর-পাঁচেক ডাক্তারি প্র্যাক্টিস করেই তাঁর ও রকম ডাক্তারির ওপর প্রবল বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। তাঁর নিজের ভাষায়, ''... (ডাক্তারি করতে গিয়ে) আমার মতো আর একজন মানুষকে হত্যা করা বা তাঁর ক্ষতি করার চিন্তাটাই আমার কাছে সবচেয়ে আতঙ্কজনক, এতটাই আতঙ্কজনক যে আমি ... প্র্যাক্টিস করাই ছেড়ে দিলাম...''। এই ব্যাপারটা কিন্তু কিছু অতিরঞ্জন নয়, এটা নিখাদ সত্যি; সে সময়ে ডাক্তারি পড়তে আসা অন্যদের চাইতে আজ তাঁকে এ ব্যাপারে বেশ খানিকটা দূরদর্শী বলেই মনে হয়।

প্র্যাক্টিস ছেড়ে দিয়ে হ্যানিম্যান লেখালিখি আর কেমিস্ট্রি চর্চা করতে লাগলেন। এই করতে গিয়ে তিনি এক নতুন তত্ত্ব আনলেন - যে সব পদার্থ শরীরে বেশি মাত্রায় প্রয়োগে একটি রোগের লক্ষণ দেখা যায়, সেই পদার্থের অত্যল্প মাত্রায় প্রয়োগে সেই বিশেষ রোগটি সেরে যায়। অত্যল্প মাত্রায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি আবার আর একটা ধারণা আনলেন, শুধু পদার্থটি অল্প হলে হবে না, তাকে জল বা অ্যালকোহলে গুলে দ্রবণে পরিণত করার সময়ে সেটিকে বিশেষভাবে ঝাঁকুনি দিতে হবে, তবেই সেই পদার্থটি ওষুধে রূপান্তরিত হবে; তাতে কোনও অজানা উপায়ে কার্যকারিতা বজায় থাকবে কিন্তু পার্শ্বক্রিয়া বিলুপ্ত হবে। এটা রসায়নের নিয়মে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তার চেয়ে অসম্ভব ব্যাপার হল, পদার্থটিকে ওষুধ হতে হলে অত্যল্প মাত্রার দ্রবণে পরিণত করতে হবে। অত্যল্প মানে কতটা অল্প? দেখা গেল যে, হোমিওপ্যাথরা হ্যানিম্যানের আমল থেকে যে মাত্রার দ্রবণ ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন, সেই মাত্রায় পদার্থটির একটি অণুও এক লিটার ওষুধে থাকে না। এটা হ্যানিম্যানের সময়ে অতটা জানা ছিল না, কিন্তু এখন খুব ভালভাবে প্রমাণিত সত্য, যে হোমিওপ্যাথি ওষুধে যে লঘুকরণ (dilution) করা হয়, তা প্রায়ই ১-এর পিঠে ২৩টা শূন্য বসালে যত হয়, তার চাইতে বেশি। খুব প্রচলিত একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধ হল Nat Mur পুরো কথাটা হল Natrum Muriaticum, যদি জটিল লাগে তা হলে বলি, ওটা খাবার নুন সোডিয়াম ক্লোরাইড-এর আরেক নাম। Nat Mur 30x বলে একটা ওষুধ চলে— সেই ওষুধের দশ হাজার লিটারে একটা মাত্র নুন-এর অণু পাওয়া যায়।

একটা অণুর চাইতে কম পরিমাণ আমাদের পরিচিত কোনও জিনিস সম্ভব নয়, অণুর চাইতে ছোট করে ভাঙলে সেই জিনিসে আর তার কোনও ধর্ম থাকবে না। নুনকে ভাঙতে ভাঙতে যদি একটা অণুতে পরিণত করা যায়, তখনও সেটা নুনই থাকবে। কিন্তু তার চাইতে ছোট করে ভাঙলে সেটা সোডিয়াম আর ক্লোরিন নামে দু'টো আলাদা পদার্থ হয়ে যাবে; সোডিয়াম হল একটা ধাতু, আর ক্লোরিন হল একটা বিষাক্ত গ্যাস। আরও ভাঙলে তারা ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদিতে পরিণত হবে, তাদের মধ্যে নুনের ধর্ম হাজার খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। মোটামুটি ৪০ গ্রাম খাবার নুনে সোডিয়াম ক্লোরাইড অণুর সংখ্যা ৬.০২৩ x ১-এর পিঠে ২৩টা শূন্য। বা অন্য কথায়, এক গ্রাম খাবার নুনে নুন - জিনিসটার অণুর সংখ্যা ১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ - এর কাছাকাছি। এবার যদি এই একগ্রাম খাবার নুনকে খানিকটা জলে (বা অ্যালকোহলে) মেশাই তা হলে কিছুদূর পর্যন্ত সেই দ্রবণ-এর কোনও অংশ থেকে একটুখানি তুললেই তার মধ্যে একটি না একটি নুনের অণু চলে আসবে। কিন্তু যদি এই দ্রবণটার সঙ্গে অনেক অনেক জল মিশিয়ে খুব করে পাতলা করে দিই? তা হলে এমন একটা সময় আসবে যখন অনেকটা দ্রবণ তুললেও একটা নুনের অণুও আসবে না। তার মানে, Nat Mur 30x বলে যে ওষুধে বিষাদরোগ থেকে একজিমা ও কোষ্ঠকাঠিন্য — এ রকম অনেক কিছুর চিকিৎসা হয়, তার মোটামুটি ১০,০০০,০০০ মিলিলিটারে (বা দশ হাজার লিটারে) একটা মাত্র নুনের অণু পাওয়ার কথা। এক ফোঁটা ওষুধ, যেমনটা হোমিওপ্যাথ ডাক্তারবাবুরা খেতে বলেন, তাতে Natrum Muriaticum তথা নুনের একটা অণু থাকার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। **'আর্নিকা ৩০'-এই ওষুধটার সঙ্গে আমরা খুব পরিচিত। সেটার ক্ষেত্রেও আপনি যা দু-চার ফোঁটা 'ওষুধ' খাচ্ছেন, তাতে আর্নিকা পদার্থটার লেশমাত্র নেই।** হোমিওপ্যাথি প্রথা মেনে এই আর্নিকা বা ন্যাট মুর (নুন) জিনিসটাকে ওষুধ না বলে 'রেমিডি' বলব এখন থেকে।

এই জিনিসটা এখন আর হোমিওপ্যাথরা অস্বীকার করেন না। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে যখন হ্যানিম্যান হোমিও-তত্ত্ব রচনা করছিলেন, তখন ইটালির অ্যামাদেও অ্যাভোগাদ্রো অন্য একটা তত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা করছিলেন। হ্যানিম্যানের মতো একটা-দু'টো পর্যবেক্ষণ থেকে সবার জন্য সর্বকালে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য মহানিয়ম বার করে ফেলার মতো এলেমের দাবিদার অ্যাভোগাদ্রো ছিলেন না। তাঁর তত্ত্বপ্রস্তাব আস্তে আস্তে, কিন্তু খুব সুনিশ্চিতভাবে, প্রমাণ করে যে এক গ্রাম অণু পরিমাণ এক-একটি যৌগ বা মৌলের মধ্যে অণুর সংখ্যা সর্বদা সমান।

'গ্রাম-অণু পরিমাণ' ব্যাপারটা খটোমটো হয়ে গেল তো? দাঁড়ান দেখি, ব্যাপারটা পুরো না বলেও একটু আভাস দেওয়া যাক। লোহা বা অক্সিজেন এক-একটা মৌল। আবার জল বা নুন হল এক-একটা যৌগ। লোহাকে ভাঙলে আর লোহা ছাড়া আর কোনও মৌল পাওয়া যাবে না, কিন্তু জলকে ভাঙলে পাওয়া যাবে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন বলে দুটো গ্যাস; নুনকে ভাঙলে পাবেন সোডিয়াম ধাতু আর ক্লোরিন গ্যাস। আর নুনজল হল মিশ্র পদার্থ, বিশুদ্ধ জলে অক্সিজেন মেশালে সেটাও একটা মিশ্র পদার্থ। আমরা

মিশ্র পদার্থকে আপাতত ধর্তব্যের মধ্যে আনছি না। সব মৌল সমান ভারী নয়, হাইড্রোজেনের একটা পরমাণু খুব হালকা আর পারদের একটা পরমাণু অনেক ভারী। একটা মৌল বা যৌগের আণবিক ভর তার একটা অণুর মধ্যের সব মৌলের সব পরমাণুর পারমাণবিক ভরের যোগফলের সমান। যেমন সোডিয়ামের পারমাণবিক ভর ২৩ আর ক্লোরিনের পারমাণবিক ভর ১৭, আর নুনের একটা অণুতে একটা সোডিয়ামের পরমাণু আর একটা ক্লোরিনের পরমাণু আছে। সুতরাং নুনের আণবিক ভর ২৩ + ১৭ = ৪০। অ্যাভোগাদ্রোর পরীক্ষা ও প্রমাণ, ও তার থেকে ধাপে ধাপে পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমাদের কাছে নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করে দিল, যে কোনও যৌগ বা মৌলের 'গ্রাম-অণু পরিমাণে'র মধ্যে অণুর সংখ্যা সর্বদা সমান। তার মানে, নুনের আণবিক ভর ৪০ আর জলের আণবিক ভর ১৮; ৪০ গ্রাম নুনে বা ১৮ গ্রাম জলে একই সংখ্যক অণু আছে, আর সেই সংখ্যা মোটামুটি ৬-এর পিঠে ২৩টা শূন্য বসালে যে সংখ্যাটা হয়, তত বড়। এটা বেশ কল্পনাতীত বড় সংখ্যা সন্দেহ নেই, কিন্তু হোমিওপ্যাথি লঘুকরণ তার চাইতেও বেশি বড়। যেমন 'আর্নিকা ৩০'—এই 'ওষুধ'-টাতে এক ভাগ 'আর্নিকা' ('আর্নিকা' একরকম গাছের নাম) ১-এর পিঠে তিরিশটা শূন্য বসালে যত হয়, ততটা অ্যালকোহল বা জলে মেশানো হয়েছে। ফলে আর্নিকা ৩০ ওষুধের এক শিশিতেও 'আর্নিকা' জিনিসটা একেবারেই নেই।

হোমিওপ্যাথি ওষুধ ঠিক করে কী পরীক্ষা করে?

কোন রোগের কী ওষুধ হবে, সেটা বাছার জন্য হোমিওপ্যাথি যে পদ্ধতির আশ্রয় নেয় তাকে বলে 'প্রুভিং'। কোনও 'রেমিডি' যদি সুস্থ শরীরে এক রকম রোগলক্ষণ-সমূহ সৃষ্টি করে তা হলে সেই 'রেমিডি'কে অতি-লঘু করলে সেটা ওই রকম রোগলক্ষণ-সমূহ আছে এমন রোগে কার্যকর হবে, এটা ধরে নেওয়া হয়। 'রেমিডি'-সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় 'রেমিডি'টা আদৌ কোনও রোগীর দেহে প্রয়োগ করা হয় না, সেটা প্রয়োগ করা হয় সুস্থ মানুষের দেহে, এবং দেখা হয় সে মানুষের দেহে কোন রোগলক্ষণসমূহ ফুটে উঠল। সেটা দেখে পরীক্ষাধীন পদার্থটি অতি-লঘু দ্রবণ করে সেই রোগলক্ষণসমূহের 'রেমিডি' হবে—এরকম ঠিক করা হয়। এটাই হোমিওপ্যাথির প্রসিদ্ধ 'সদৃশ বিধান তত্ত্ব'। হ্যানিম্যানের মতে, রোগ দেহের বাইরে থেকে আক্রমণকারী কোনও ব্যাপার নয়, তা সম্পূর্ণ জীবের এক অংশ। আর অসুখ হল 'জীবনীশক্তি'-র বিঘ্ন-সঞ্জাত এক অবস্থা। রোগের 'সদৃশ বিধান তত্ত্ব', বা অসুখের 'জীবনীশক্তি'-র তত্ত্ব হলো হোমিওপ্যাথির অবশ্য-স্বীকার্য বা স্বতঃসিদ্ধ, এদের প্রশ্ন করা চলে না, মেনে নিতে হয়। আর মানতে হয় লঘুকরণের ফলে 'রেমিডি'র খারাপ দিক বা পার্শ্বক্রিয়া লোপ পাবে, অথচ তার ভাল দিক, রোগ সারানোর ক্ষমতা, বেড়ে যাবে। হ্যানিম্যান নিজে ১ এর পিঠে ৬০টা শূন্য বসালে যত হয়, তত ভাগ জলে বা অ্যালকোহলে এক ভাগ 'রেমিডি'র এই রকম লঘুকরণ হরদম ব্যবহার করতেন। তাতে পৃথিবীর সমান আয়তনের জলে 'রেমিডি'র একটি অণু থাকার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য।

জলের স্মৃতি :

এরকম 'রেমিডি'-তে যে 'রেমিডি' জিনিসটার বস্তু বলতে কিছুই থাকে না, সেটা এখন সব হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক বা তাত্ত্বিকরা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা দু'টো কথা বলেন। এক, জিনিস থাক আর না-ই থাক, কাজ তো

> 'আর্নিকা ৩০'-এই ওষুধটার সঙ্গে আমরা খুব পরিচিত। সেটার ক্ষেত্রেও আপনি যা দু-চার ফোঁটা 'ওষুধ' খাচ্ছেন, তাতে আর্নিকা পদার্থটার লেশমাত্র নেই।

হচ্ছে। এ-ব্যাপারে আমরা দেখেছি, কাজ করা বলতে যদি কোনও অসুখ সারানো বা রোগের কষ্ট কমানো হয়, তা হলে হোমিওপ্যাথি ওষুধের ক্ষমতা 'প্ল্যাসিবো' বা 'রোগীতোষ ক্রিয়া'-র চাইতে বেশি, সেটা কোনও নিরপেক্ষ 'ড্রাগ ট্রায়াল'-এ প্রমাণিত হয়নি। আর দ্বিতীয় যে কথাটা হোমিওপ্যাথরা বলেন, তা হলো, যদিও রসায়নশাস্ত্রের বিচারে 'রেমিডি' বলে কথিত জিনিসটা রোগী পাচ্ছেই না, তবু কোনও অজানা উপায়ে 'রেমিডি'র কাজ চলে; মানুষ তো আর সর্বজ্ঞ হয়ে যায়নি।

১৯৮৮ সাল নাগাদ ফরাসি চিকিৎসক-বিজ্ঞানী জাঁ বেনভেনিস্তে এ নিয়ে বেশ বিতর্ক তুলেছিলেন, বলেছিলেন তাঁর ল্যাবরেটরিতে 'বেসোফিল' নামক শ্বেতরক্তকণিকা অ্যান্টিবডি-র অতি-লঘুকৃত দ্রবণ, যাতে অ্যান্টিবডি-র একটা অণুও নেই, তার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, যেন দ্রবণে সত্যিকারের অ্যান্টিবডি আছে। এটা হোমিওপ্যাথির লঘুকরণ-তত্ত্বের সমর্থকদের খুব উৎসাহিত করে; তাঁরা বলতে শুরু করেন, 'দেখলে তো, আগেই বলেছিলুম...।' 'নেচার'-এর সত্যানুসন্ধানী দল বেনভেনিস্তের ল্যাবরেটারিতে গিয়ে পরীক্ষাটি খতিয়ে দেখে। তখন তারা দেখে, অ্যান্টিবডি-র অতি-লঘুকৃত দ্রবণ আর শুধু জল— বেসোফিলের ওপর এ দু'টো জিনিসের প্রভাব তুল্যমূল্য। অর্থাৎ সাদা বাংলায়, জাঁ বেনভেনিস্তে ভুল দেখেছিলেন, বা ভুল বলেছিলেন—অতি-লঘুকৃত দ্রবণের সত্যিকারের কোনও ক্ষমতা নেই।

সে যাই হোক, এক বেনভেনিস্তে ভুল প্রমাণ হয়ে পাদপ্রদীপের আলো থেকে সরে গেছেন, হয়তো আর এক বেনভেনিস্তে-সম কেউ আসবেন, আর হোমিওপ্যাথরা নতুন কোনও ব্যাখ্যা সাময়িক ভাবে খুঁজে পাবেন। আমাদের মনে হয়, ওষুধের কার্যকারিতা প্রমাণিত হলে ব্যাখ্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার তার পরে, ওষুধটাকে গ্রহণ করা যেতেই পারে। কিন্তু যা কাজ করে কি না, সে-ব্যাপারেই কোনও প্রমাণ নেই, সেটা কী ভাবে কাজ করে থাকতে পারে, সেই প্রশ্নের জবাব পাবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। সম্প্রতি ২০১০ সালে নোবেলজয়ী ফরাসী বিজ্ঞানী লুচ মাঁতিয়ের আবার জলের 'স্মৃতিশক্তি'-র কথা তুলেছেন, এমনকী জাঁ বেনভেনিস্তে-কে 'আধুনিক গ্যালিলিও' আখ্যা দিয়েছেন। হোমিওপ্যাথরাও স্বাভাবিকভাবে এটা নিয়েও খুব হৈ-চৈ করেছেন। প্রসঙ্গত শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই, জেমস র‍্যান্ডি, 'নেচার'-এর ওই সত্যানুসন্ধানী দলের একজন সদস্য, একটা পুরস্কার ঘোষণা করে রেখেছেন। পরীক্ষায় যে ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছিল বলে বেনভেনিস্তে-র দাবি, সেটা যদি কেউ সত্যি বলে হাতেকলমে করে দেখাতে পারেন, তা হলে ১০ লাখ ডলার পুরস্কার! যাঁরা বেনভেনিস্তেকে মন থেকে সত্যি বলে ভাবেন, তাঁরা একটু কষ্ট করলে প্রায় ৫ কোটি টাকা হাতেনাতে পেতে পারেন — লুচ মাঁতিয়ের ভেবে দেখবেন। মাঁতিয়ের বলেছেন,

অতি-লঘুকৃত দ্রবণের কার্যকারিতা থাকে না, এটা তিনি মনে করেন না। কিন্তু বিজ্ঞানে তো প্রমাণ বলতে একজন বড় বিজ্ঞানীর মনে করা বা না করা বোঝায় না, সুতরাং আমরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করব, মাঁতিয়ের বা অন্য কেউ কোনও প্রমাণ হাজির করতে পারেন কি না, নইলে এ সব কথা কৌতূহলের গণ্ডি পেরিয়ে এক দিন কৌতুক-মাত্রে পর্যবসিত হবে।

তবু তো রোগী সারে! :

এ বার আসি 'প্ল্যাসিবো' বা 'রোগীতোষ' ক্ষমতা ব্যাপারে। দেখা গেছে কোনও রোগীকে রোগের সঠিক ওষুধ না দিয়ে যদি চিকিৎসকরা তাঁর কথাগুলো মন দিয়ে শোনেন, তাঁকে পরীক্ষা করে দেখেন, আর অকার্যকর কিছু ধরুন এক টুকরো চিনি, ট্যাবলেটের মতো করে মোড়কে ভরে খেতে দেন, আর রোগী সেটা ওষুধ ভেবে খান, তা হলে তাঁর রোগ বহু ক্ষেত্রেই তাড়াতাড়ি সারে, অন্তত যে রোগী কোনও রকম চিকিৎসা (বা চিকিৎসার ভান) পাচ্ছেন না, তাঁর তুলনায় তাড়াতাড়ি। এটা হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্বীকৃত সত্য। ওই যে বলে না, ডাক্তারের কথা শুনেই রোগ অর্ধেক ভাল হয়ে গেল, সেই রকম আর কী। অনেকে বলেন, না হোমিওপ্যাথি খারাপ নয়, হয়তো তা 'প্ল্যাসিবো' হিসাবে কাজ করে। কিন্তু যা 'প্ল্যাসিবো' হিসাবে কাজ করে তাকে তো ওষুধের সংজ্ঞা অনুযায়ী ওষুধ গোত্রেই ফেলতে পারব না। কেননা ওষুধ হল সেই জিনিস, যা রোগ নিরাময়ে 'প্ল্যাসিবো'র ক্ষমতার চাইতে বেশি ক্ষমতা দেখায়। দ্বিতীয় কথা হল, **'প্ল্যাসিবো'র মতোই কাজ করলে অহেতুক সময় নষ্ট করে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার তৈরি করা কেন?** ভারী সুন্দর কথা গুছিয়ে বলতে পারেন এমন কেউ রোগীকে দেখে যাহোক একটা মিষ্টি দানা বা ঝাঁজ-ঝাঁজ ফোঁটা 'প্রেসক্রাইব' করে দেবেন, ব্যাস, কেল্লা ফতে।

হোমিওপ্যাথির পার্শ্বক্রিয়া : হোমিওপ্যাথি ওষুধের 'সাইড এফেক্ট', অর্থাৎ ক্ষতিকারক দিক কি নেই? যে 'ওষুধ'-এর কোনও কার্যকারিতা নেই, কোনও ওষুধ-অণু নেই, তার ক্ষতিকারক দিক কেমন করে থাকবে? অবশ্য বড়সড় অসুখে হোমিওপ্যাথি করলে আসল চিকিৎসার বিলম্ব হয় এবং রোগ ভয়ানক আকার ধারণ করে। ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যুও অসম্ভব নয়। তাই সামান্য ব্যথাবেদনা কমাতে হোমিওপ্যাথি করলে তেমন কোনও ক্ষতি নেই, তবে ম্যালেরিয়া কী ক্যানসারের মতো সাংঘাতিক রোগে হোমিওপ্যাথির আশ্রয় নেওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। এই বিষয়ে একটা মাত্র ঘটনার উল্লেখ করে হোমিওপ্যাথির কথা স্থগিত রাখব। ঘটনাটি বিলেতের। বেশ কিছু ইংরেজ ভ্রমণকারী ম্যালেরিয়া-প্রবণ দেশগুলিতে ভ্রমণের আগে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক হোমিওপ্যাথিক বড়ি খান। হয়তো বলবেন, সে আবার কী, ওই সব সাহেব-সুবোদের দেশেও হোমিওপ্যাথি? অবাক হওয়ার কিছু নেই, সাক্ষাৎ রাজপুত্র চার্লসও হোমিওপ্যাথি প্রচারে উদগ্রীব, তবে অসুখ-বিসুখ করলে হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালে যান বলে তেমন শুনিনি। ফিরে আসি গল্পে। ম্যালেরিয়ার বড়ি খেয়েও বেশ কিছু ভ্রমণকারী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। এই নিয়ে বেশ তুলকালাম চলে, এবং বিরোধিতার নেতৃত্বে ছিলেন স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক ড. সাইমন সিং। এই প্রতিবাদের সময় এক হোমিওপ্যাথ চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করা হয়, কী পদ্ধতিতে হোমিওপ্যাথিক বড়ি ম্যালেরিয়ায় কাজ করে? তিনি বলেন, ''হোমিওপ্যাথিক বড়ি এমন ভাবে কাজ করে যে আপনার শক্তি (energy)-তে ম্যালেরিয়া আকৃতির কোনও ফুটো না থাকে। সুতরাং ম্যালেরিয়া টাইপ মশারা এসে সেটাতে ঢুকতে পারে না।'' প্রিয় পাঠক, ঘাবড়াবেন না, ঠিকই পড়েছেন। তবে গল্প এখানেই শেষ নয়।

যখন ড. সিং হোমিওপ্যাথি-বিশেষজ্ঞ এবং ইংল্যান্ডের হোমিওপ্যাথি সংস্থার মুখপাত্র শ্রীমতী মেলানি অক্সলেকে প্রশ্ন করেন, এই বক্তব্যের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কী, তখন শ্রীমতী অক্সলে উত্তর দেন, যে ওঁর সংস্থা এমন চিকিৎসককে সাবধান করে দেবে এবং এমন অবান্তর কথা বরদাস্ত করা হবে না। কিন্তু তাঁর নিজের উত্তরের শেষে শ্রীমতী অক্সলে যা বললেন তা-ই বা কম কীসে? তিনি বললেন— ''হোমিওপ্যাথি প্রায় ৩০০ বছর ধরে আছে। (পাঠক মনে রেখেছেন নিশ্চয়, হোমিওপ্যাথির জনক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান জন্মেছিলেন ১৭৫৫ সালে, হোমিওপ্যাথি শব্দটা তিনি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ১৮০৭ সালে, অর্থাৎ দু'শো বছর আগে।) এটা ম্যালেরিয়া ইত্যাদি নানা রোগপ্রতিরোধে সন্তোষ- জনকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ... এবং ম্যালেরিয়ার 'রেমেডি' প্রথম প্রুভ, বা আমরা যাকে বলি আবিষ্কার, করা হয়েছে।'' (নিম্নরেখ বর্তমান লেখক কর্তৃক সংযোজিত) বুঝুন কেমন বিশেষজ্ঞ। কথা হচ্ছে ম্যালেরিয়া হওয়ার আগে তা ঠেকানোর ওষুধ (আচ্ছা, না হয় 'রেমেডি'-ই হল!) নিয়ে, আর উনি হ্যানিম্যান কবে লঘুকৃত সিনকোনাকে ম্যালেরিয়া সারানোর ওষুধ বলে দাবি করেছিলেন, সেটাকে প্রথম হোমিওপ্যাথিক আবিষ্কার বলে দাবি করছেন। প্রকৃতপক্ষে সিনকোনা (লঘুকৃত নয়) হোমিওপ্যাথির 'আবিষ্কার' নয়, ম্যালেরিয়ার ওষুধ হিসেবে তা চালু ছিল হ্যানিম্যান বা হোমিওপ্যাথি জন্মানোর বহু আগে থেকেই।

তবে বাঁচোয়া এই যে বিলেতের 'মেডিসিন অ্যান্ড হেলথকেয়ার রেগুলেটরি এজেন্সি' হোমিওপ্যাথিকে এখনও ওষুধ হিসেবে গণ্য করে না। বিলেতের সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগ সদ্য হোমিওপ্যাথির জন্য 'ফান্ডিং' বন্ধ করেছে। এর জন্য ড. সাইমন সিং-এর অবদান অসামান্য। আমেরিকাতেও সরকারি স্বীকৃতি এখনও মেলেনি হোমিওপ্যাথির। আর মিলবেই বা কেমন করে? আজ পর্যন্ত বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কোনও হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কার্যকারিতা চিনির দানার চাইতে বেশি বলে প্রমাণ হয়নি। মেটাঅ্যানালিসিস, অর্থাৎ **বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল রাশিবিজ্ঞান সম্মতভাবে একত্রিত করে বিশ্লেষণ করা, কোনও হোমিওপ্যাথিক 'ওষুধ'কে ওষুধ হিসাবে কার্যকর প্রমাণ করতে পারেনি।**

২০০২ সালে 'ব্রিটিশ জার্নাল অফ ক্লিনিকাল ফার্মাকোলজি'-তে ডা. এডজার্ড আর্নস্ট (Dr Edzard Ernst) হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতার এক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক বড়ির কোনও ক্ষমতা নেই। ২০০৫ সালে আমেরিকার বিখ্যাত পত্রিকা 'দ্য ল্যান্সেট'-এ একটি 'মেটাঅ্যানালিসিস' প্রকাশিত হয়, যাতে ১১০টা হোমিওপ্যাথিক আর ১১০টা অ্যালোপ্যাথিক ট্রায়াল বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। তাতেও হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ক্ষমতা 'প্ল্যাসিবো'র চাইতে বেশি নয় বলে দেখা যায়। সংক্ষেপে বলা যায়, হোমিওপ্যাথির রোগ সারানোর বা প্রতিরোধের কোনও ক্ষমতাই নেই। 'সাইড এফেক্ট' বা ক্ষতিকর দিক আছে কি না, তা বুঝতে গেলে আগে বুঝতে হবে চিকিৎসায় ক্ষতি কত ভাবে হতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো হোমিওপ্যাথির কোনও ক্ষতিকর দিক নেই। কিন্তু হোমিওপ্যাথি করতে গিয়ে বহু মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে — যেমন হয়েছিল ম্যালেরিয়ার

হোমিওপ্যাথিক প্রতিষেধক নেওয়া বিলিতি ভ্রমণকারীদের। কখনও কখনও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা গরিব দেশগুলিতে লোভনীয়, কারণ তা সহজলভ্য এবং কম খরচসাপেক্ষ। এই সমস্যার সমাধান হয়তো বর্তমান ব্যবস্থায় অসম্ভব, বিশেষ করে যে সব দেশে গরিবদের জন্য চিকিৎসাব্যবস্থা নিম্ন মানের। তবে এই ভুয়ো নিরাপত্তাবোধ হোমিওপ্যাথির বড় ক্ষতিকারক দিক। বিলিতি ভ্রমণকারীরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেও অর্থ ও অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা তাঁদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু গরিব দেশের গরিব রোগীরা এই অবস্থায় অসহায় ভাবে মারা যাবেন। এর পরেও কি বলা সম্ভব, 'অনিষ্ট তো হয় নাই?'

তবুও মানুষ কেন? এত সব জানার পরেও কি বিকল্প ওষুধের বিক্রি কমবে? আমার অন্তত সে ধারণা নয়। ২০০৫ সালের 'দ্য ল্যান্সেট' জার্নালে গবেষণাপত্রটি প্রকাশের পরে অনেকে ভেবেছিলেন, হোমিওপ্যাথির সুদিন বোধহয় শেষ হল। কিন্তু মার্কিন পরিসংখ্যান থেকে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, ২০০২ সালে যেখানে ৩৪,৯৯,০০০ জন মানুষ হোমিওপ্যাথির শরণাপন্ন হতেন, সেখানে ২০০৭ সালে ৩৯,০৯,০০০ জন হোমিওপ্যাথি করাচ্ছেন। আয়ুর্বেদ আমেরিকায় এখনও তেমন সুবিধা করতে পারেনি, তবু ২০০২ থেকে ২০০৭ এর মধ্যে আয়ুর্বেদের ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১,৫৪,০০০ থেকে বেড়ে প্রায় ২,১৪,০০০তে পৌঁছেছে। ভারতবর্ষের কথা না হয় বাদই দিলাম। সেখানে তো প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত হোমিওপ্যাথিক ও অন্যান্য বিকল্প চিকিৎসার গুণগানে মত্ত।

এমন কেন হয়? এত কিছু জানার পরেও মানুষ কেন আরও বেশি করে অকেজো এবং অন্তিম অর্থে ক্ষতিকারক ব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট হয়? এর উত্তর পাওয়া যায় হোমিওপ্যাথির ভক্তদের উক্তি পড়লে। 'দ্য ল্যান্সেট'-এর গবেষণাপত্রটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এক অভাবনীয় তৎপরতা দেখা যায় হোমিওপ্যাথির ভক্তদের মধ্যে। 'ল্যান্সেট'-এর পত্রটিকে ভুল প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা চলে, আর অন্য দিকে হোমিও-ভক্তরা নিজেদের মধ্যে পরিসংখ্যান সংগ্রহ শুরু করেন, উদ্দেশ্য - 'হোমিওপ্যাথিক কমিউনিটি'তে কেমন অভিঘাত পড়েছে সেটা জানা। তারপর তাঁরা বেশ আনন্দের সঙ্গে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেন। তাঁদের সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের ৪৩.২০ শতাংশ বলেন, 'ল্যান্সেট'-এর পত্র নাকি হোমিওপ্যাথির প্রতি শ্রদ্ধা বাড়াতে সাহায্য করবে। ৩২.৬০ শতাংশ বলেন, এই গবেষণা তাঁদের মত পাল্টাতে পারবে না। ৬.১০ শতাংশ জানেন না, এই পত্রের কী অভিঘাত হবে। তবে এক উল্লেখযোগ্য অংশ, প্রায় ১৮ শতাংশ, মনে করেছিলেন এটা হোমিওপ্যাথির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ১৮ শতাংশ হোমিও-ভক্তের দুশ্চিন্তা খুব একটা ফেলনা ব্যাপার নয়।

কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, হোমিওপ্যাথি করছেন এমন মানুষের

> আপাতদৃষ্টিতে হয়তো হোমিওপ্যাথির কোনও ক্ষতিকর দিক নেই। কিন্তু হোমিওপ্যাথি করতে গিয়ে বহু মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে...

সংখ্যা বেড়ে গেছে; সুতরাং ঐ ৪৩.২০ শতাংশই ঠিক অনুমান করেছিলেন। ২০০২ থেকে ২০০৭-এর মধ্যে হোমিওপ্যাথির ব্যবহার প্রায় ১৪ শতাংশ বেড়ে গেল, 'রাগন' নামে এক ভারতীয় ব্লগার তাঁর ব্লগে এমন অনুমানই করেছিলেন। 'রাগন' লেখেন, ''আমার মতে, ল্যান্সেট রিপোর্ট ভারতে হোমিওপ্যাথি ভালবাসেন যাঁরা, তাঁদের ওপর কোনও প্রভাব ফেলবে না। মেডিক্যাল জার্নালে কী বেরলো না বেরলো, তার তোয়াক্কা না করে যাঁরা হোমিওপ্যাথি করছেন তাঁরা তাই চালিয়ে যাবেন।" এই মানসিকতা বিজ্ঞানের তোয়াক্কা করে না। মেডিক্যাল জার্নালে কী প্রকাশ হল না হল সে নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। প্রেম যখন অন্ধ, তখন যুক্তির কে ধার ধারে? 'রাগন'-এর মতো আরও অনেকেই অমন কথা লিখেছেন, কিন্তু আর একটি দল আছে যাঁরা 'রাগন'-দের চেয়ে ভয়ঙ্কর। এঁরা 'রাগন'-দের মতো মানুষকে ব্যবহার করেন নিজেদের স্বার্থের জন্য, যেমন TA Sciences ব্যবহার করেছিল মি. এগান-কে।

সবার শেষে আবার ফিরি রবিঠাকুরে। সেই অন্নদাবাবুর পিল-এর গল্প। অন্নদাবাবু যেন অনেকটা 'রাগন'-এর মতো, সরল, ভালমানুষ। হেমনলিনীর যুক্তিযুক্ত কথা তাঁকে টলাতে পারেনি। পারতো হয়তো, কিন্তু অন্নদাবাবুকে অন্ধ রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন কিছু স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। আছেন অন্নদাবাবুর প্রিয়পাত্র অক্ষয়, যাঁর আসল উদ্দেশ্য হল হেমনলিনীর পাণিগ্রহণ। অন্নদাবাবু অচিকিৎসক, কিন্তু চিকিৎসা-যশোপ্রার্থী। নিজের মেয়ের অবিশ্বাসকে ভুল প্রমাণের জন্য চাইলেন অক্ষয়ের দিকে। অক্ষয় মোসাহেবির এমন সুযোগ কি হাতছাড়া করতে পারে?

''তোমরা কিছুই বিশ্বাস করনা,'' রবীন্দ্রনাথের অন্নদাবাবু বললেন, ইঙ্গিতটা অবশ্যই হেমনলিনীর দিকে। ''আচ্ছা, অক্ষয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়ো দেখি, আমার চিকিৎসায় সে উপকার পাইয়াছে কিনা।" সেই প্রামাণিক সাক্ষীকে তলবের ভয়ে হেমনলিনীকে নিরুত্তর হইতে হইল। কিন্তু সাক্ষী আপনি হাজির হইল। আসিয়াই অন্নদাবাবুকে কহিল, ''অন্নদাবাবু, আপনার সেই পিল আমাকে আর একটি দিতে হইবে। বড়ো উপকার হইয়াছে। আজ শরীর এমন হালকা বোধ হইতেছে।"

অন্নদাবাবু সগর্বে তাঁহার কন্যার দিকে তাকাইলেন।

লেখক পরিচিতি : রাজা ভট্টাচার্য, মুম্বাই আই আই টি থেকে এম এসসি পাশ করে কলকাতার বোস ইনস্টিট্যুটে পিএইচডি করেছেন; তারপর আমেরিকাতে ফিলডেলফিয়ার টমাস জেফারসন ইউনিভার্সিটি থেকে পোস্টডক্টরাল ফেলোশিপ করেছেন। বর্তমানে ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতাল ও হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল (বস্টন)-এ নিউরোলজি নিয়ে গবেষণা করছেন।

সুস্থ থাকার ব্যায়াম

(পর্ব-১)

সুস্থ বলতে যদি নীরোগ শরীরে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার কথা ভাবেন, তো তার জন্য ব্যায়াম এক রকম। আবার যদি আটচল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি আর তেত্রিশ ইঞ্চি বাইসেপস বাগানোর তাল করেন, তা হলে অন্য রকম। রোগবালাই দূরে রেখে বহু দিন বাঁচার বৈজ্ঞানিক ফর্মুলা দিচ্ছেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রি**।

অমলবাবুর হার্টের রোগ, আর সেই সুবাদে তিনি বছর-পাঁচেক ধরে আমার চিকিৎসায় আছেন। রোগী হিসেবে তিনি বেশ ভাল। ডাক্তারের কাছে 'ভাল রোগী' মানে জানেন তো? 'ভাল রোগী' হলেন তিনি যিনি ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলেন। অমলবাবু তাঁর ওষুধ ঠিকমতো খান, সময়ে দেখিয়ে যান, খাবার-দাবার ব্যায়াম ইত্যাদি নিয়ে যা যা পরামর্শ আমি দিই, তিনি মেনে চলেন।

ভালই ছিলেন অমলবাবু। আমার কাছে আসার সময় বেশ মোটাসোটা ছিলেন, কিন্তু আস্তে আস্তে সেই ক্ষতিকারক ফ্যাট আর ভুঁড়ি তিনি কমাতে পেরেছিলেন। খাওয়ার ব্যাপারে লোভ সামলে আর নিয়মিত ব্যায়াম করে, চেহারাটা বদলেই ফেলেছিলেন। কিন্তু কী যে হল গত ছ'মাসে! তিনি একটু একটু করে বেশ মোটা হয়েছেন। গত বার তেমন পাত্তা দিইনি, কিন্তু এ বার চেপে ধরলাম। এবং ঝুলি থেকে বেরোল বেড়াল।

কমলবাবুর রক্তচাপ বেশি, চলতি কথায় বলি ব্লাড প্রেশারের রোগ। তাঁর ওজন কমাতে হয়েছিল দস্তুর মতো ঘাম ঝরিয়ে। মানে শুরুতে আমিই ঘাম ঝরাচ্ছিলাম, বোঝানোর বিস্তর চেষ্টা করছিলাম যে খানিক রোগা হওয়া তাঁর কতটা দরকার। প্রথমে কথা কানে তোলেন নি, কিন্তু তারপর চেনাশোনা নানা জনের কাছে ওজন কমানোর সুফলের কথা শুনে অনেক হাঁটাহাঁটি করে ঘাম ঝরিয়ে রোগা হয়েছেন। তাতে তাঁর ব্লাডপ্রেসার কমেছে, ভাল আছেন সব দিক থেকেই। কিন্তু এ বার মাস আষ্টেক পরে এলেন তিনি, একেবারে পুরনো মেদবহুল চেহারা। চেপে ধরতেই ঝুলি থেকে বেরোল সেই বেড়ালটাই।

বিমলবাবু আমার রোগী নন, তবে বিশেষ পরিচিত। তাঁর আবার ফিটনেসের বাতিক বলা যেতে পারে। একবার জিম-এর বাই তো আরেক বার পাড়ার ছেলেদের নিয়ে সাতসকালে ফুটবল পেটানো। সে দিন দেখি, তিনি ফুটবলটা যেন পাঞ্জাবির ভেতরে রেখেছেন! কী সর্বনাশ, ওটা তো ফুটবল নয়, ভুঁড়ি! বিমলবাবুর ভুঁড়ি!! ভাবছি সৌজন্য বজায় রেখে কী ভাবে গোয়েন্দাগিরি শুরু করা যায়, তো তিনি নিজেই ভুঁড়িসমস্যার সাতকাহন শুরু করলেন। খানিক পরেই বেরিয়ে এল ঝুলির সেই চেনা বেড়ালটা।

বেড়াল কিন্তু বাঘের মাসি : হেঁয়ালি ভাল লাগছে না? তা হলে সোজা বাংলায় বলি। বেশ কিছু দিন হল, প্রাণায়াম নামে একটি বস্তু স্বাস্থ্য-বাজারে বেশ গেড়ে বসেছে। একেবারে নামগোত্রহীন উড়ে-এসে-জুড়ে বসা ব্যাপার নয় এটি, রীতিমতো হাজার-হাজার বছরের ভারতীয় ঐতিহ্যের দাবিদার। তা এর ইতিহাস নিয়ে আমার তেমন জানা নেই, কিন্তু এর বিজ্ঞান নিয়ে খুবই মাথাব্যথা আছে।

দাঁড়ান দাঁড়ান, আমি মোটেই বলছি না প্রাণায়াম করলে কেউ মোটা হয়ে যায়। না, অমল-কমল-বিমলবাবুরা প্রত্যেকে প্রাণায়াম করেছেন বটে, আর তার পরে মোটা হয়েছেন সেটাও সত্যি, কিন্তু প্রাণায়াম কারও মেদ বাড়ায়, এটা কষ্টকল্পনা। তা হলে প্রাণায়াম নিয়ে আমার মাথাব্যথা কীসের? আর আমার রোগীরা প্রাণায়াম করার পরে মোটা হচ্ছেন—এটাই বা বলছি কেন?

আসলে প্রাণায়াম, বা বলা ভাল, প্রাণায়াম-প্রবক্তারা, নানা রকম দাবি করছেন। চর্বি কমে যাবে, ডায়াবেটিস সেরে যাবে, উচ্চরক্তচাপ ঠিক হয়ে যাবে—তার জন্য ওষুধ লাগবে না। এবং বিশেষ খাটতেও হবে না। এইটাই 'লোকে খাচ্ছে'। এই যে 'সাইড-এফেক্ট' নেই, ভবিষ্যতে ওষুধ ছেড়ে দেওয়ার আশ্বাস রয়েছে, এবং সর্বোপরি না খেটে হাতেনাতে ফললাভ—এটাতেই মজেছে পাবলিক। মিষ্টি কথার এই এক সুবিধা। বিশেষত ঘাম না ঝরিয়ে ফললাভ হবে—এ কথাটা লোকের বড্ড মিষ্টি লাগে। আর তাঁরা ভাবেন, আরে এত হাজার বছরের ভারতীয় মুনি-ঋষিদের ঐতিহ্য, সায়েন্স দিয়ে ব্যাখ্যা করার দরকার কী? সত্যি কথা বলতে কী, আমি জানি কিছু অত্যন্ত উচ্চমানের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, আমারই বন্ধু অনেকে রোগীকে প্রাণায়াম করতে বলছেন। মানুষের বিশ্বাস আরও বাড়ছে। ওষুধ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারটা ভবিষ্যতের গর্ভে থাকছে। আমরা চিকিৎসকেরা অনেক সময় বলে দিতে বাধ্য হই, না, আপনার ওষুধ বন্ধ করা যাবে না, বা ওষুধ

বন্ধ করার সম্ভাবনা খুব কম। তাতে অনেক মানুষ নিজেকে অসহায় বা চিররোগী মনে করেন। তাঁদের পক্ষে ওষুধ বন্ধের সম্ভাবনা এক বড় প্রলোভন—ঠেকানো কঠিন।

প্রাণায়াম করলে কী হয় বা কী হয় না সে কথায় পরে আসব। অমল-কমল-বিমলবাবুরা আসলে প্রাণায়াম করেছেন তাঁদের পুরনো ব্যায়ামের পরিবর্তে, আর তাতেই হয়েছে বিপত্তি। ব্যায়াম করে যে সুফলগুলো তাঁরা পাচ্ছিলেন সেগুলো উধাও হয়েছে, আর দৃশ্যমান কুফল, অর্থাৎ মেদবৃদ্ধি চোখেই দেখা যাচ্ছে। ব্যায়াম নিয়ে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা মাথার ব্যায়াম নেহাত কম করেননি, আর কোন ব্যায়াম কোন অবস্থায় করা দরকার সেটা আমাদের এখন বেশ ভালভাবেই জানা আছে। প্রথমে সেই কথায় আসি।

কেন ব্যায়াম?

সবাই একই উদ্দেশ্যে ব্যায়াম করেন না, তাই একই ব্যায়াম সবার জন্য ঠিক নয়। একজন বডি-বিল্ডার বা একজন অ্যাকশন ফিল্মের হিরো যে উদ্দেশ্যে শরীর চর্চা করেন, এক হৃদ্‌রোগী হরিপদ কেরানি সে উদ্দেশ্যে করেন না। উদ্দেশ্য আলাদা হলে ব্যায়াম বদলাবে। এই লেখায় আমরা হৃতিক রোশনের চাইতে হরিপদ কেরানিকে বেশি গুরুত্ব দেব। কিন্তু তার আগে বলে রাখি, আমাদের কালচারটা এমন যে টিভিতে বা নানা ম্যাগাজিনে অ্যাকশন ফিল্মের হিরো বা অতি-তন্বী হিরোইন কী করে হওয়া যায় তার টিপস সহজপ্রাপ্য, কিন্তু সুস্থ সবল জীবনের জন্য কী করবেন সেটা নিয়ে লেখা-বলা বড় কম। সেরকম লেখা যদি বা পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রায়শই বিজ্ঞানের বদলে অপ্রমাণিত আপ্তবাক্যের ছড়াছড়ি—''তিন পা হাঁটলেই সুস্থ'' ধরনের পাঠকতোষ লেখা। আমরা এখানে সেটা করব না। যে সব শরীরচর্চা কার্যকর বলে প্রমাণিত, কেবল তাদের কথাই বলব।

আমাদের শরীরচর্চার উদ্দেশ্য হল—নীরোগ, সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকা। আর যদি রোগ হয়েই থাকে তো সেই রোগের প্রকোপ কমানো, আর যতটা সম্ভব কর্মক্ষম থাকা। এই উদ্দেশ্যে শরীরচর্চা করলে মেদবৃদ্ধি হবে না, বাড়তি মেদ ঝরবে, সুতরাং আপনা থেকেই দেহ সুগঠিত হবে। তবে দারা সিং বা জনি ওয়েসমূলার হবার কোনও সম্ভাবনা নেই।

কোন্ ব্যায়াম?

এবার কাজের কথায় আসি। ঠিক কোন্ ব্যায়ামটা করবেন আপনি? আমাদের দেশে ক্রমাগত বাড়ছে ডায়াবেটিস আর উচ্চ রক্তচাপ। সুতরাং আপনার যদি এই সব রোগ থাকে তো সেটা মাথায় রেখে শরীরচর্চার ধরন ঠিক করতে হবে। আর যদি আপনার রোগ দু'টোর কোনওটাই না থাকে, তা হলে সেই রোগগুলো যাতে না হয় তার চেষ্টা করতে হবে। সুবিধার ব্যাপার হল, রোগ দু'টো থাকুক আর না থাকুক, শরীরচর্চার মূল ব্যাপারগুলো একই থাকে। এবং এই ধরনের শরীরচর্চায় ফাউ হিসেবে পাওয়া যায় কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি। সাধারণ ছোঁয়াচে রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ে বলে মনে করা হয়। কিন্তু এটার কোনও পাথুরে প্রমাণ আমাদের হাতে এখনও নেই বলে এটাকে আমরা গুরুত্ব দেব না।

বহু মানুষের কাছে হাঁটাটাই একমাত্র সম্ভব ও সহজসাধ্য। হেঁটে অ্যারোবিক ব্যায়াম করা যায়, কিন্তু সেটা গয়ংগচ্ছ মৃদুমন্থর হাঁটলে হবে না। এমন জোরে হাঁটতে হবে সুকুমার রায় কথিত প্যালারামের মতো ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাস পড়ে, হাঁটতে হাঁটতে কোনও মতে কথা বলা চলতে পারে, কিন্তু গান গাওয়া সম্ভব নয়।

ব্যায়াম বা যে কোনও শারীরিক পরিশ্রমের নানা ধরন আছে। আমরা শুরু করব অ্যারোবিক ব্যায়াম নিয়ে, কারণ এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে দরকারি। কেন দরকারি, এবং ঠিক কী কী উপকার কী ভাবে হয়, সে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে অ্যারোবিক ব্যায়াম জিনিসটা কী সেটা বলি। একজন ত্রিশ-চল্লিশ বছরের মোটের ওপর সুস্থ মানুষকে আপাতত আমি আমার 'আদর্শ মানুষ' বলে ধরে নিচ্ছি। পরে অবশ্য দেখব, সামান্য রকমফের করে অন্য মানুষদের জন্যও এই একই পরামর্শ কার্যকর। ব্যায়াম ও শরীরচর্চা—এই দু'টো কথাকে আমরা এখন থেকে একই অর্থে ব্যবহার করব, এবং ব্যায়াম বলতেই যে ডনবৈঠক-মার্কা ধারণা আছে, সেটাকে একটু বদলে নিয়ে শরীরের উপকারের তাগিদে করা সমস্ত শারীরিক কসরতকেই আমরা ব্যায়াম বা শরীরচর্চা বলে অভিহিত করব। আমাদের এই নতুন ডিকসনারিতে ফুটবল খেলাও হল একরকম ব্যায়াম।

তা হলে অ্যারোবিক ব্যায়াম কী? অ্যারোবিক ব্যায়াম করতে গেলে দৌড়তে, বা বেশ জোরে হাঁটতে বা সাঁতার কাটতে, বা লাফদড়ি খেলতে, বা দ্রুত সাইকেল চালাতে হবে। ফুটবল খেলা, ব্যাডমিন্টন কী টেনিস খেলা—এ সবেও বেশ অ্যারোবিক ব্যায়াম হয়। হাঁটার কথা একটু আলাদা করে বলা ভাল, কারণ বহু মানুষের কাছে হাঁটাটাই একমাত্র সম্ভব ও সহজসাধ্য। হেঁটে অ্যারোবিক ব্যায়াম করা যায়, কিন্তু সেটা গয়ংগচ্ছ মৃদুমন্থর হাঁটলে হবে না। এমন জোরে হাঁটতে হবে সুকুমার রায় কথিত প্যালারামের মতো ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাস পড়ে, হাঁটতে হাঁটতে কোনও মতে কথা বলা চলতে পারে, কিন্তু গান গাওয়া সম্ভব নয়।

তা এটাকে 'অ্যারোবিক' ব্যায়াম কেন বলে? অ্যারোবিক (aerobic) শব্দটা air বা বাতাস কথাটা থেকে এসেছে। অক্সিজেন বা বাতাস (এয়ার) দিয়ে এই ব্যায়ামের প্রয়োজনীয় শক্তি যোগানো হয়। এই ব্যায়াম চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের প্রায় পুরোটাই মাংসপেশিতে ব্যবহৃত হয়। তাই এর নাম এয়ার-ওবিক বা অ্যারোবিক ব্যায়াম। মোটরগাড়িতে যেমন

পেট্রোল পুড়ে শক্তি উৎপন্ন হয়, আমাদের শরীরেও তেমনই খাদ্য 'পুড়ে' বা খাদ্যের দহন হয়ে শক্তি উৎপন্ন হয়। আমরা যে খাদ্যই খাই না কেন, শরীরের কোষগুলো মূলত গ্লুকোজ হিসেবেই খাদ্য পায় ও তা ব্যবহার করতে পারে। সমস্ত খাদ্যকে তাই আমাদের যকৃৎ বা লিভার গ্লুকোজে পরিণত করে, আর রক্তের মাধ্যমে তা কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে। গ্লুকোজ পেট্রোল-লাইটারের পেট্রোলের মতো দাউদাউ করে পোড়ে না, মোটরগাড়ির পেট্রোলের মতো আস্তে আস্তে পোড়ে। গাড়ি চললে যেমন পেট্রোল পোড়ার তাপে ইঞ্জিন গরম হয়ে যায়, তেমনই ব্যায়াম করার সময়ে দেহের ভেতরে খাদ্য দহনের তাপে দেহ গরম হয়ে যায়। তবে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলে ইঞ্জিনে পেট্রোল পোড়া পুরো বন্ধ হয়ে যায়, ইঞ্জিন একেবারে ঠান্ডা হয়ে যায়। আমাদের দেহে বেঁচে থাকাকালীন সেটা হওয়ার জো নেই। বিশ্রামরত অবস্থাতেও দেহে অল্প কিছু খাদ্য পুড়বে, আর তার তাপে শরীর কিছুটা গরম থাকবে।

পৃথিবী গ্রহের নিয়ম হল, কোনও কিছু পোড়াতে অক্সিজেন লাগে। আমাদের দেহে খাদ্য পোড়াতেও অক্সিজেন লাগে, আর সেই অক্সিজেন আসে বাতাস থেকে। বাতাসের অক্সিজেন আমরা নিঃশ্বাসের সাহায্যে ফুসফুসের মধ্যে নিই। তারপর ফুসফুস থেকে অক্সিজেন রক্তের মাধ্যমে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। তাই যখন বেশি বেশি করে খাদ্য পোড়ে, তখন আমরা ফোঁসফোঁস করে শ্বাস নিই বা হাঁপাই। তাতে ফুসফুসে অনেক বাতাস ঢোকে, আর ভেতরে-ঢোকা সেই বাতাস থেকে ফুসফুসের রক্ত অক্সিজেন টেনে নেয়। সেই অক্সিজেন-ভরা রক্তকে কোষে কোষে পৌঁছে দেয় হৃদযন্ত্র। হৃদযন্ত্র হল রক্ত চালানোর পাম্প, সারা শরীরে রক্ত চালায় হৃদযন্ত্রই। বেশি অক্সিজেন কোষে পৌঁছে দেওয়ার জন্য হৃদযন্ত্রকে বাড়তি খাটতে হয়। ফলে হৃদযন্ত্র তাড়াতাড়ি আর বেশি জোরে সংকোচন প্রসারণ করে। আমাদের হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়, আমরা বলি নাড়ির গতি বা পালস রেট বেড়েছে। আর প্রতিটা সংকোচন প্রসারণে হৃদযন্ত্র বেশি রক্ত পাম্প করে, তাই নাড়ির জোরও বাড়ে—সেটা অবশ্য চিকিৎসক ছাড়া অন্যদের বোঝা শক্ত। সব মিলিয়ে ফুসফুস, হৃদযন্ত্র আর পেশিতে রক্ত-সরবরাহকারী রক্তনালীর কাজ বাড়ে, তবেই পেশির কোষে কোষে দরকারমতো বেশি অক্সিজেন পৌঁছয়। ব্যায়ামের সময় মাংসপেশিতেই বেশি অক্সিজেন দরকার, কেননা ব্যায়ামে মাংসপেশির দ্রুত সংকোচন-প্রসারণ ঘটে, আর সেই কাজটা করবার জন্য বেশি গ্লুকোজ দহন করতে হয়। ফুটবল খেলার মত ব্যায়ামে শরীরের প্রায় সমস্ত মাংসপেশিকে কাজ করতে হয়, আর তার জন্য শরীরে বিশ্রামরত অবস্থার তুলনায় দশগুণ অক্সিজেন লাগা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

অ্যারোবিক ব্যায়াম হল সেই ধরনের ব্যায়াম যাতে ব্যায়াম চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের পুরোটা, বা প্রায় পুরোটা, ফুসফুস আর হৃদযন্ত্র এদুয়ের যুগলবন্দিতে মাংসপেশিতে পৌঁছে যায়। অক্সিজেন বা বাতাস (এয়ার) দিয়ে এই ব্যায়ামের প্রয়োজনীয় শক্তি যোগানো হয় বলে এর নাম 'বাতাসি' ব্যায়াম, অর্থাৎ এয়ার-ওবিক বা অ্যারোবিক ব্যায়াম। এর আরেক নাম হল আইসোটোনিক ব্যায়াম। এর বিপরীতে আছে আইসোমেট্রিক ব্যায়াম। আপনি যদি দেওয়াল ধরে ঠেলেন তাহলে মাংসপেশিগুলো কাজ করবে, তাদের শক্তি উৎপাদন বাড়বে, কিন্তু অক্সিজেন ছাড়াই এই শক্তির বেশিরভাগটা উৎপাদিত হবে। ডাম্বেল-বারবেল করা, বা আধুনিক জিমে গিয়ে পেশিবহুল দেহ গঠন করার ব্যায়াম এই শ্রেণির ব্যায়াম। এদের বলে আইসোমেট্রিক ব্যায়াম বা অ্যানঅ্যারোবিক ব্যায়াম। এই ব্যায়াম করাকালীন নানা কারণে খুব তাড়াতাড়ি রক্তচাপ বাড়ে, আর পেশির মধ্যেকার রক্তবাহী নালীগুলো সংকুচিত হয়ে যায় বলে পেশিতে বেশি রক্ত যেতে পারে না। ফলে এই ব্যায়ামে পেশিগুলো খুব তাড়াতাড়ি অক্সিজেন ছাড়া খাদ্য আধপোড়া করে শক্তি নিষ্কাশন করতে বাধ্য হয়। আমাদের শরীরে একটা ব্যবস্থা আছে যেটা দিয়ে অক্সিজেন ছাড়া খাদ্য থেকে খানিকটা শক্তি পাওয়া যায়, তবে সেটা দীর্ঘস্থায়ী ভাবে চালানো যায় না। যাঁদের বাড়িতে 'ইনভার্টার' আছে তাঁরা জানেন যে ইলেকট্রিক সাপ্লাই চলে গেলে কিছুক্ষণ ইনভার্টার দিয়ে লাইট ফ্যান চালানো যায়, কিন্তু সেটা কিছুক্ষণই মাত্র। কেন না ইনভার্টার জিনিসটাকে তারপর ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর সাহায্যে চার্জ করে না নিলে তার লাইট ফ্যান চালানোর ক্ষমতা দ্রুত লোপ পায়। ঠিক সেই রকম আমাদের দেহে রয়েছে অক্সিজেন ছাড়া খাদ্য থেকে শক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা। ওটা সাময়িক। আর আইসোমেট্রিক ব্যায়াম বা অ্যানঅ্যারোবিক ব্যায়াম ওই পদ্ধতিটা ব্যবহার করে বলে ওই রকম ব্যায়াম বেশি সময় চালানো যায় না। এ ব্যাপারে আবার পরে আসব।

অ্যারোবিক ব্যায়াম—কতটা, কতক্ষণ?

আমার কল্পিত মোটামুটি সুস্থ শরীরের তিরিশ-চল্লিশ বছর বয়সের মানুষের আদর্শ অ্যারোবিক ব্যায়াম কী হবে?

১। দৈনিক এক দফায় ৩০ থেকে ৬০ মিনিট ব্যায়াম।

২। তীব্র ব্যায়াম, যাতে হৃদস্পন্দনের হার বাড়ে। বেড়ে সেই হার সেই ব্যক্তির সর্বোচ্চ হৃদস্পন্দন হারের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ হয়।

৩। শরীরের সমস্ত বড় মাংসপেশিগুলোকে খাটাতে হবে। নিম্নাঙ্গ, উর্ধাঙ্গ ও মধ্যভাগ—সব জায়গার বড় মাংসপেশিকে কাজে লাগাতে হবে।

৪। পেশির ভেতরকার টানভাব বাড়বে না। মানে আইসোমেট্রিক ব্যায়াম বা অ্যানারোবিক ব্যায়াম চলবে না, বা করলেও সেটা অ্যারোবিক ব্যায়াম কমিয়ে করা চলবে না।

এছাড়া এই ব্যায়ামে বিশেষ শারীরিক কুশলতার প্রয়োজন না হলেই ভাল। দামি যন্ত্রপাতি না লাগাই বাঞ্ছনীয়। এবং ব্যায়ামটা যেন আনন্দদায়ক হয়, নইলে অভ্যাস বজায় রাখা মুশকিল। দ্রুত হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতার কাটা, ফুটবল খেলা, সাইকেল চালানো, ব্যাডমিন্টন বা টেনিস খেলা—যেমন আগেই বলেছি—দৈনিক এক-আধ ঘণ্টা এই সব করলে আদর্শ অ্যারোবিক ব্যায়াম হবে।

এবার আসি আদর্শ অ্যারোবিক ব্যায়ামের ওই গুণগুলো থাকা কেন উচিত, সে প্রসঙ্গে। তার আগে এটা আরেক বার বলে দিতে চাই, এক নম্বর থেকে চার নম্বর গুণের তালিকা আমার ঠিক করা নয়। এমনকী বিজ্ঞানীরা

একটা সময় আসে যখন ফুসফুসের রক্তে অক্সিজেন ভরার ক্ষমতা হৃদ্‌যন্ত্রের রক্ত সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা, আর মাংসপেশির রক্ত থেকে অক্সিজেন নিষ্কাশন করে নেওয়ার ক্ষমতা—এই সম্মিলিত প্রচেষ্টাটা তার শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। এটাকেই আমরা চলতি ভাষায় বলি ‘দম ফুরিয়ে গেছে’।

কেবল তত্ত্বের দিক থেকে দেখেছেন যে ওই রকম ব্যায়াম করা দরকার, তা-ও নয়। এটা তত্ত্ব ও মানুষের ওপর পরীক্ষা করে পাওয়া তথ্য—এ দু'য়ের ওপরেই ভিত্তি করে রচিত। প্রথমে আসি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রসঙ্গে, তার মাঝেমধ্যে পরীক্ষালব্ধ বিপুল তথ্যভান্ডার থেকে কিছু উদাহরণ দেওয়া যাবে।

ব্যায়ামের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (১)

একজন মাঝবয়সী মানুষ বিশ্রামের সময় অল্প শক্তি খরচ করে, তাই তার অক্সিজেন খরচও কম হয়। অ্যারোবিক ব্যায়াম বা অন্য কাজের সময় তার মাংসপেশির শক্তি খরচ বাড়ে, ফলে অক্সিজেন ও খাদ্য দু'য়ের খরচই বাড়ে। সাধারণ অবস্থায় আমাদের শরীরে খাদ্য বা গ্লুকোজের যোগানে টান ধরে অনেক দেরিতে, কিন্তু অক্সিজেনের জোগানে টান ধরে তাড়াতাড়ি। একটা সময় আসে যখন ফুসফুসের রক্তে অক্সিজেন ভরার ক্ষমতা, হৃদ্‌যন্ত্রের রক্ত সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা, আর মাংসপেশির রক্ত থেকে অক্সিজেন নিষ্কাশন করে নেওয়ার ক্ষমতা—এই সম্মিলিত প্রচেষ্টাটা তার শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। এটাকেই আমরা চলতি ভাষায় বলি ‘দম ফুরিয়ে গেছে’। এই সময়ের কিছু আগেই কেবলমাত্র অক্সিজেন ব্যবহার করে বা অ্যারোবিক পদ্ধতিতে শরীরের শক্তির চাহিদা পুরো মেটানো যায় না। ডাক পড়ে ‘অ্যানঅ্যারোবিক’ ব্যবস্থার। আমরা আগেই দেখেছি, আমাদের শরীরে এই একটা ব্যবস্থা আছে যেটা দিয়ে অক্সিজেন ছাড়া খাদ্য থেকে খানিকটা শক্তি পাওয়া যায়। দম ফুরিয়ে যাবার কিছু আগে থেকেই অ্যারোবিক ও অ্যানঅ্যারোবিক দু'রকম পদ্ধতিই চলতে থাকে। যে মানুষটি নিয়মিত শরীরচর্চা করেন না, তাঁর শরীরে অ্যারোবিক পদ্ধতির ক্ষমতা দ্রুত ফুরিয়ে যায়, কেননা তাঁর ফুসফুস, হৃদযন্ত্র ও মাংসপেশির অক্সিজেন সরবরাহ ও ব্যবহার করার ক্ষমতা কম।

কোনও মানুষের অক্সিজেন ব্যবহার করার ক্ষমতার ঊর্ধ্বসীমাকে পরিভাষায় বলা হয় ভিও-টু ম্যাক্স (VO_2 Max)। নিয়মিত শরীরচর্চা না করা সুস্থ মানুষের ভিও-টু ম্যাক্স তাঁর বিশ্রামরত অবস্থায় অক্সিজেন ব্যবহারের মোটামুটি দশগুণ। বিশ্রামের সময় সাধারণত গ্রাম-পিছু অক্সিজেন ব্যবহার হল ৩.৫ মিলিলিটার, অর্থাৎ একজন মানুষ তাঁর ওজনের প্রতি একগ্রাম পিছু

৩.৫ মিলিলিটার অক্সিজেন ব্যবহার করেন। আর ব্যায়ামের সময় তাঁর ওজনের প্রতি এক গ্রাম পিছু ৩৫ মিলিলিটার অক্সিজেন ব্যবহার করার ক্ষমতা থাকে। এই রকম অবস্থায় একজন পৌঁছে গেলে তারপর তাঁর ব্যায়াম চালিয়ে যেতে কষ্ট হয়, খুব হাঁপাতে থাকেন ও হৃদগতি খুব বেড়ে যায়। ‘ভিও-টু ম্যাক্স’ পরিমাণ অক্সিজেন ব্যবহার সীমায় পৌঁছনোর একটু আগে থেকেই ব্যায়ামের প্রয়োজনীয় শক্তির একটা অংশ অ্যানঅ্যারোবিক পদ্ধতিতে আসে। তার ফলে পেশিতে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয়, পেশিতে দ্রুত ব্যথা হয়, ক্লান্তি অনুভবও বেশি হয়।

আরও নির্দিষ্ট করে বললে, পরিশ্রম করার ফলে অক্সিজেন ব্যবহারের ঊর্ধ্বসীমার তথা ‘ভিও-টু ম্যাক্স’-এর শতকরা ৭০ ভাগ অক্সিজেন যখন কেউ ব্যবহার করছেন, তখনই অ্যানঅ্যারোবিক পদ্ধতির ডাক পড়ছে। পরিশ্রমের এই মাত্রাকে বলে ‘অ্যানঅ্যারোবিক থ্রেশহোল্ড’, বাংলায় বলতে পারি ‘অ্যানঅ্যারোবিক মাত্রাসীমা’। এর চাইতে বেশি পরিশ্রম করলেই কষ্ট। কিন্তু নিয়মিত অ্যারোবিক ব্যায়াম করেন যিনি, তাঁর ‘অ্যানঅ্যারোবিক মাত্রাসীমা’ খানিক দূর পর্যন্ত ক্রমে বাড়তে থাকে। এটা সুস্থ মানুষের জন্য সত্য, এবং অনেক রোগীর জন্যও সত্য। দু'ভাবে এই ‘মাত্রাসীমা’ বাড়ে। এক হল তাঁর অক্সিজেন ব্যবহারের ঊর্ধ্বসীমা (ভিও-টু ম্যাক্স) বেড়ে যায়; অর্থাৎ তাঁর শরীর অনেক বেশি দক্ষতার সঙ্গে অক্সিজেন ব্যবহার করতে পারে। দুই, তাঁর শরীর ভিও-টু ম্যাক্স-এর শতকরা ৭০ ভাগের চাইতে বেশি অংশ কাজে লাগাতে পারে।

ব্যায়ামের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (২)

সুতরাং এখন বোঝা যাচ্ছে যে, বেশিক্ষণ ধরে ব্যায়াম করতে গেলে সেটা অ্যারোবিক ব্যায়ামই হবে, নইলে পেশিতে ব্যথা হবে, পরদিন ব্যায়াম করা সম্ভব হবে না। আর নিয়মিত ব্যায়াম করলে শরীরে কতগুলো পরিবর্তন ঘটে। ফুসফুস আর হৃদযন্ত্র দু'য়ের যুগলবন্দি বেশি কাজ করতে থাকে, ফলে বেশি পরিমাণ অক্সিজেন রক্তে মেশে। আর হৃদযন্ত্র অক্সিজেনযুক্ত রক্ত দ্রুত পেশিতে পৌঁছে দেয়— হৃদস্পন্দনের গতি বাড়ে ও প্রতিটি হৃদস্পন্দন জোরদার হয়ে বেশি রক্ত ঠেলে দেয়। অ্যারোবিক ব্যায়ামের সময়ে পেশিতে গ্লুকোজের দহনের ফলে উৎপন্ন রাসায়নিক পদার্থগুলো সেই পেশির রক্তজোগানকারী রক্তনালীর ওপর প্রভাব খাটিয়ে সেগুলোকে সাময়িকভাবে চওড়া করে দেয়। ফলে পেশিতে বেশি রক্ত ঢুকতে পারে। আবার ব্যায়ামের সময়ে যেহেতু শরীরের অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় পেশিতেই সবচেয়ে বেশি রক্ত প্রবাহিত হয়, তাই পেশিতে রক্তজোগানকারী রক্তনালীগুলো চওড়া হয়ে যাওয়ার মানে হল অধিকাংশ রক্ত যাওয়ার পথ চওড়া হয়ে যাওয়া। এর ফলে শরীরের সমস্ত রক্তনালীর মিলিত ‘রোধ’ কমে। স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, রক্তনালী যত মোটা হবে, তারা

রক্ত-চলাচলের পথে তত কম বাধা সৃষ্টি করবে; ফলে রক্ত পাম্প করার জন্য হৃদযন্ত্রকে তত কম খাটতে হবে। আর অ্যারোবিক ব্যায়াম করার ফলে সবচেয়ে কেজো রক্তনালীগুলোই চওড়া হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং রক্ত পাম্প করার জন্য হৃদযন্ত্রকে অনেক কম খাটতে হচ্ছে।

আইসোমেট্রিক ব্যায়াম তথা অ্যানঅ্যারোবিক ব্যায়ামে ঠিক উল্টো জিনিসটা ঘটে। এতে পেশির ভেতরে পেশিতন্তুগুলোর চাপ বাড়ে, তারা পেশির রক্তনালীগুলোকে চারি দিক থেকে চেপে ধরে। ফলে রক্তনালীগুলো যায় সরু হয়ে, আর তাদের রোধ বা রক্তপ্রবাহে বাধাদানের ক্ষমতা বাড়ে। ফলে রক্ত পাম্প করার জন্য হৃদযন্ত্রকে আরও বেশি খাটতে হয়। এ ছাড়াও ডাম্বেল-বারবেল বা ওই রকম কিছু নিয়ে ব্যায়াম করতে গেলে বুকভরা শ্বাস নিয়ে কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে থাকতে হয়। সেই সময়ে বুকের ভিতরকার বায়ুচাপ অনেকটা বেড়ে যায়। শরীরের নানা জায়গা থেকে হৃদযন্ত্রে রক্ত ফেরত নিয়ে আসছে যে সব রক্তনালী, সেই উচ্চ বায়ুচাপ তাদের ওপরে কাজ করে রক্ত ফিরিয়ে আনার কাজটাতে বাধা সৃষ্টি করে।

ফলে একদিকে উচ্চ রক্তচাপের বিরুদ্ধে কাজ করে রক্ত পাম্প করার শক্ত কাজ চালু রাখা, আর তার ওপর রক্ত কম পরিমাণে ফেরত আসার মোকাবিলা করা—এর জন্য হৃদযন্ত্রকে অ্যানঅ্যারোবিক ব্যায়ামের সময় প্রচণ্ড বাধার মুখোমুখি হয়ে কাজ করতে হয়। এই ব্যায়ামে শরীরে দেখানোর মতো সব মাংসপেশি তৈরি হয় বটে, কিন্তু হৃদযন্ত্রের কোনও উপকার হয় না। একদম সুস্থ লোকের পক্ষে রয়েসয়ে এরকম ব্যায়াম ক্ষতিকর নয়, কিন্তু যাঁর হৃদযন্ত্র কোনও কারণে দুর্বল তাঁর প্রাণঘাতী হৃদছন্দপতন (Cardiac arrhythmia) হওয়া অসম্ভব নয়। তবে সুস্থ মানুষ অ্যারোবিক ব্যায়ামের উপযুক্ত শক্তিশালী পেশিগঠনের উদ্দেশ্যে অল্পস্বল্প আইসোমেট্রিক ব্যায়াম করতে পারেন।

নিয়মিত অ্যারোবিক ব্যায়ামের ফলে হৃদযন্ত্রের পেশিগুলো বেশি কর্মক্ষম হয়, ফলে একবার হৃদস্পন্দনের দ্বারা অনেক বেশি রক্ত দেহে পাম্প করতে পারে। বিশ্রামের সময়, বা একই রকম কাজ করার সময়, নিয়মিত অ্যারোবিক ব্যায়ামকারীদের হৃদস্পন্দনের হার তুলনায় কম হয়। এর একটা বড় সুবিধা আছে। হৃদস্পন্দনের হার যত বাড়ে হৃদযন্ত্র তত দ্রুত পাম্প করতে বাধ্য হয়। পাম্প করার দুটো ধাপ, একধাপে হৃদযন্ত্র-গহ্বর সংকুচিত হয়ে রক্ত ছড়িয়ে দেয়। অন্য ধাপে হৃদযন্ত্র-গহ্বর প্রসারিত হয়, ও সেই রক্ত হৃদযন্ত্রে ফেরত আসে।

হৃদযন্ত্র দ্রুত রক্ত পাম্প করতে বাধ্য হলে তার সংকোচন-ধাপের (systole) চাইতে প্রসারণ-ধাপ (diastole) বেশি কমে যায়। অ্যারোবিক ব্যায়ামকারীদের হৃদস্পন্দনের হার তুলনায় কম হওয়ার ফলে তাদের হৃদযন্ত্রের প্রসারণ-ধাপ কমে না। প্রসারণ-ধাপ হল হৃদপেশির বিশ্রামের সময়, বিশ্রাম যত বাড়বে তত তার ক্ষয়পূরণ হবে। যে যন্ত্রটা বছরের পর বছর একটানা কাজ করে চলেছে তার বিশ্রাম ও ক্ষয়পূরণ যত বেশি হবে ততই সে যন্ত্রের ভাল থাকার সম্ভাবনা। অর্থাৎ নিয়মিত অ্যারোবিক ব্যায়ামে হৃদযন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী উপকার।

ব্যায়ামের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (৩)

দেখানোর মতো শরীর গঠন করতে যে আইসোমেট্রিক ব্যায়াম করা হয় তার একটা বৈশিষ্ট্য হল, নিম্নাঙ্গের তুলনায় উর্ধাঙ্গের দেখনদারী পেশি গড়ে তোলা। ফলে এতে নিম্নাঙ্গের তুলনায় উর্ধাঙ্গের ব্যায়াম বেশি হয়, বুক আর হাতের ব্যায়াম বেশি হয়। কিন্তু অ্যারোবিক ব্যায়ামের সময় আমরা কোন দিকের ব্যায়াম বেশি করব— নিম্নাঙ্গের না কি উর্ধাঙ্গের? আমার দেওয়া অ্যারোবিক ব্যায়ামের উদাহরণে (হাঁটা, ফুটবল খেলা, সাইকেল চালানো) নিম্নাঙ্গের ব্যায়ামই বেশি, সেটা কি আকস্মিক নাকি জেনে বুঝে?

জেনে বুঝেই নিম্নাঙ্গের ব্যায়ামের ওপর বেশি জোর দেওয়া। আমাদের প্রকৃতিদত্ত পেশিগুলোর মধ্যে নিম্নাঙ্গের পেশিগুলোই সবচেয়ে বড়মাপের আর শক্তিশালী। দেহের মোট রক্তনালীর একটা বড় অংশ হল নিম্নাঙ্গের পেশির মধ্যেকার রক্তনালীগুলো। আমরা আগেই জেনেছি অ্যারোবিক ব্যায়ামে পেশির মধ্যেকার রক্তনালী চওড়া হয়ে যায়। নিম্নাঙ্গের পেশির ব্যায়াম করালে দেহের রক্তনালীগুলোর একটা বড় অংশই চওড়া হয়ে যায়, ফলে রক্তনালীর মোট রোধ কমে। কিন্তু উর্ধাঙ্গের অ্যারোবিক ব্যায়ামে দেহের সব রক্তনালীর একটা ছোট অংশই চওড়া হয়, ফলে রক্তনালীর মোট রোধ তেমন কমে না। তাই কেবল উর্ধাঙ্গের ব্যায়াম, তা অ্যারোবিক হলেও রক্তচাপ তুলনায় বেশি বাড়ায় আর হৃদযন্ত্রের ওপর বেশি চাপ ফেলে। সুতরাং সাঁতার কাটার মতো নিম্নাঙ্গ ও উর্ধাঙ্গের মিলিত ব্যায়াম সবচেয়ে ভাল, কিন্তু সেটা না পারলে কেবল নিম্নাঙ্গের ব্যায়ামই ভাল।

কিছু প্রশ্ন যে পাঠক-পাঠিকাদের মনে বুড়বুড়ি কাটছে সে আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। কিন্তু এই আক্রাগন্ডার দিনে আমি এত নিউজপ্রিন্ট 'খেয়ে ফেললে' সম্পাদক মশাই চটিতং হয়ে উঠবেন, সুতরাং দেখা হবে **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**-র পরের সংখ্যায়, কেমন?

লেখক পরিচিতি : ডা. গৌতম মিস্ত্রি, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম (কার্ডিওলজি), হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

কুইজ উত্তর :

(১) সত্যি। অর্শ হলে সেই রক্তনালীগুলো মোটা হয়ে যায়। (২) মিথ্যা। আপৎকালীন জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি যৌনসঙ্গমের ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত পরে খেলে তা কাজে লাগে। (৩) মিথ্যা। যেমন ডেঙ্গুর মশা ভোরের দিকেই কামড়ায়। (৪) মিথ্যা। Breastfeeding week ছিল ১-৭ আগস্ট, ২০১৩। (৫) মিথ্যা। স্তনে ক্যানসার ছাড়াও অন্য অনেক রকম টিউমার হয়। (৬) সত্যি। অন্তঃকর্ণ আর গলার সংযোগকারী 'ইউস্টেচিয়ান নালী' বাচ্চাদের বোতলের দুধ খাওয়ালে ঠিক ভাবে কাজ করে না, তাই কানের সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে। (৭) মিথ্যা। নবজাতকের ওজন স্বাভাবিকের চাইতে বেশি হলে সে স্থূল, চওড়া হাড়ের কোনও ভূমিকা নেই। (৮) সত্যি। (৯) মিথ্যা। (১০) মিথ্যা। (১১) ব্যারি মার্শাল আর রবিন ওয়ারেন গ্যাস্ট্রিক আলসারে এইচ পাইলোরি ব্যাক্টেরিয়ার ভূমিকা আবিষ্কার করে ২০০৫ সালে নোবেল পুরস্কার পান। (১২) আলনার নার্ভ (Ulnar nerve)। এটি হাতের ছোট ছোট পেশীগুলোর সূক্ষ্ম কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। (১৩) কৃষকের ফুসফুস (Farmer's lung)। (১৪) ক্যাটারাক্ট বা ছানি। (১৫) অ্যানাবলিক স্টেরয়েড।

ওষুধের মূল্য-নিয়ন্ত্রণে কতটা লাভ হবে মানুষের?

খাদ্য-দ্রব্যের দাম বাড়ছে, পেট্রোলের দাম বাড়ছে, সরকার ভর্তুকি তুলে নিয়েছে রান্নার গ্যাস-ডিজেলে, ট্রেনের ভাড়া বেড়েছে। অথচ নাকি কমতে চলেছে ওষুধের দাম! কী করে তা সম্ভব? সত্যিই সম্ভব তো?— লিখছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ।**

২০১২-র জাতীয় ওষুধ মূল্য - নির্ধারণ নীতি --- National Pharmaceutical Pricing Policy (NPPP 2012) এবং ২০১৩-র ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে ২০১১-র অত্যাবশ্যক ওষুধের জাতীয় তালিকায় থাকা ৩৪৮টা ওষুধকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে আনা হয়েছে। ঠিক করা হয়েছে যে, কোনও ওষুধের যে ব্র্যান্ডগুলোর বাজারে বিক্রি সেই ওষুধের মোট বিক্রির ১%-এর বেশি সেই ব্র্যান্ডগুলোর দামের গড় করে সেই ওষুধের সিলিং দাম নির্ধারণ করা হবে। কোনও কোম্পানি সিলিং দামের চেয়ে বেশি দামে সে ওষুধ বিক্রি করতে পারবে না।

সরকার কিন্তু নিজে থেকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ করেনি বা ব্যবস্থা নেয়নি। এক দশক আগে সবার জন্য স্বাস্থ্য, সবার জন্য অত্যাবশ্যক ওষুধের দাবিতে সংগ্রামরত কতগুলো সংগঠনের সমন্বয় 'অল ইন্ডিয়া ড্রাগ অ্যাকশন নেটওয়ার্ক' (AIDAN) সুপ্রিম কোর্টে এক জনস্বার্থ মামলা করে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয়! সত্যি কি শুভ বুদ্ধির উদয়!

AIDAN-এর সদস্য সংগঠনগুলোর মধ্যে বরোদার জেনেরিক নামে সুলভ অত্যাবশ্যক ওষুধ-প্রস্তুতকারী সংস্থা LOCOST, গণস্বাস্থ্য আন্দোলনে যুক্ত চিকিৎসকদের সর্বভারতীয় সংগঠন মেডিকো ফ্রেন্ডস' সার্কল এবং ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে কর্মরত 'জনস্বাস্থ্য সহযোগ' সরকারি মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন। যাদের মামলার জেরে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, তারাই যখন এই মূল্য নিয়ন্ত্রণকে পছন্দ করছে না, তখন দেখা যাক—মূল্য নিয়ন্ত্রণের নামে আসলে কী হচ্ছে।

ভারতে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

সরকারের আদেশ নিয়ে মন্তব্য করার আগে দেখে নেওয়া যাক আমাদের দেশে কিভাবে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ হত।

আমাদের দেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ওষুধ উৎপাদক দেশগুলোর মধ্যে একটা। ২০০৯-২০১০ সালে ৬২,০৫৫ কোটি টাকার ওষুধ বিক্রি হয়েছে দেশের বাজারে আর ৪২,১৫২ কোটি টাকার ওষুধ রফতানি হয়েছে। ওষুধের আয়তনের হিসেবে ভারত পৃথিবীতে তৃতীয়, মোট দামের হিসেবে পৃথিবীতে ১৪ নম্বর। এই ফারাকের কারণ হল আমাদের দেশে ওষুধের দাম অনেক দেশের তুলনায় কম, তাই মোট আয়তন বেশি হলেও মোট দাম কম। এত উৎপাদন সত্ত্বেও অবশ্য আমাদের দেশের অধিকাংশ নাগরিক ওষুধ কিনতে পারেন না। চিকিৎসার মোট খরচের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে ওষুধের দাম।

১৯৬২-৬৩-র আগে দেশে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ছিল না। চিন-ভারত যুদ্ধের পর ভারত রক্ষা আইনের বলে ১৯৬২ এবং ৬৩-তে যথাক্রমে ওষুধের মূল্য প্রদর্শন আদেশ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি করা হয়। ১৯৬৩-র ১লা এপ্রিল যে ওষুধের যা দাম ছিল সেই দামে বেঁধে রাখা হয়। এর পরের মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ ১৯৬৬-তে। ১৯৭০-এর আদেশে ওষুধকে ১৯৫৫-র অত্যাবশ্যক পণ্য আইনের অধীনে অত্যাবশ্যক পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ওষুধ নীতি ঘোষিত হয়েছে আর তার সাথে সাথে জারি হয়েছে নতুন নতুন মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ—'৭৮, '৭৯ ও '৮৭-তে। এই পর্যায়ে মূল নীতি ছিল, অত্যাবশ্যক ওষুধগুলোর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা, পরবর্তী কালে ওষুধের কাঁচা মালের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা। পাশাপাশি ওষুধগুলোকে মানুষের আয়ত্তে আনা, দেশীয় ওষুধ শিল্পকে মজবুত করা।

বাস্তবে ১৯৭৯-এই প্রথম ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারি ভূমিকা দেখা যায়। সব ওষুধগুলোকে বিন্যস্ত করা হয় চারটে শ্রেণিতে এবং লাভের সীমা স্থির করে দেওয়া হয়।

শ্রেণি	কী ধরনের ওষুধ	লাভের হার
প্রথম	জীবনদায়ী	৪০%
দ্বিতীয়	জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক	৫৫%
তৃতীয়	অন্যান্য	১০০%
চতুর্থ	নতুন ও বাকি সব ওষুধ	লাভের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই।

ভাবা হয়েছিল এই শ্রেণি বিভাগের ফলে জনসাধারণ জীবনদায়ী এবং অত্যাবশ্যক ওষুধ কম দামে পাবেন। আর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ওষুধ উৎপাদনে ওষুধ কোম্পানিগুলোর যে কম লাভ হবে তা তারা পুষিয়ে নেবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল—ওষুধ কোম্পানিগুলো জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ তৈরি কমিয়ে দিয়ে তৈরি করতে লাগল টনিক ও কাশির সিরাপের মতো অপ্রয়োজনীয় ওষুধ। যক্ষ্মা-কুষ্ঠের ওষুধের মতো দরকারি ওষুধ অমিল হতে থাকল। সরকার ওষুধ কোম্পানিগুলোকে প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যক ওষুধ তৈরিতে বাধ্য করতে পারেনি।

৯০-এর দশকে নব পর্যায়

৯০-এর দশকের আরম্ভে শুরু হল অর্থনীতির উদারীকরণ, শিল্পে লাইসেন্সিং প্রথা অবলুপ্ত হল, ওষুধ শিল্প সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ অনুমোদিত হল। কোনও ওষুধকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের আনা হবে তা ঠিক করা হতে লাগল বাজারে ওষুধের মোট বিক্রিতে বিভিন্ন কোম্পানিগুলোর অংশের ভিত্তিতে। এই জটিল হিসেবটা না বুঝে জেনে নেওয়া যাক একটা তথ্য: ২০১৩-র আদেশের আগে ৭৪টা ওষুধের কাঁচা মাল বা বাল্ক ড্রাগ এবং সেগুলো থেকে তৈরি ১৫৭৭টা ফর্মুলেশন মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় ছিল।

এই তালিকায় কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধ ছিল বটে কিন্তু তার থেকে বেশি ছিল পুরনো, বর্তমানে ব্যবহার করা হয় না এমন ওষুধ, এমনকী নিষিদ্ধ কিছু ওষুধ। তালিকায় ছিল না এইচ আই ভি / এডস, বহু ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা, ক্যান্সার, করোনারি ধমনীর রোগ, ফাইলেরিয়া, লোহার অভাবজনিত রক্তাল্পতার ওষুধ। ছিল না উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, মৃগীর অধিকাংশ প্রয়োজনীয় ওষুধ। ছিল না ও আর এস। ছিল না টিটেনাস, জলাতঙ্ক, হেপাটাইটিসের টিকা। ছিল না টিটেনাস, ডিপথেরিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত সিরাম, সাপে কাটার প্রতিষেধক।

প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যক ওষুধগুলোকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা হয়েছিল এক ভ্রান্ত ধারণা থেকে—যখন একটা ওষুধ অনেকগুলো কোম্পানি তৈরি করবে তখন বাজারে প্রতিযোগিতা থাকবে, বেশি বিক্রি পেতে ওষুধ কোম্পানিগুলো দাম কম রাখবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে— বেশি প্রতিযোগী মানেই বেশি প্রতিযোগিতা—এমনটা নয়। দেখা যায় বাজারে বেশি বিক্রি কোনও ওষুধের ব্র্যান্ডগুলোর দাম কমদামি ব্র্যান্ডগুলোর তুলনায় ১০ থেকে ৪০ গুণ বেশি।

সরকারের ভ্রান্ত নীতি

অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকার ৩৪৮টা ওষুধকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় রাখা হয়েছে ভাল কথা। কিন্তু উৎপাদন খরচের বদলে বাজারে মোট বিক্রির অংশ এবং গড় দাম থেকে সিলিং দাম ঠিক করায় কাজের কাজ কিছু হবে না, বরং ওষুধের দাম বেড়ে যাবে।

দেখুন কেন বলছি এ কথা

উচ্চ রক্তচাপ কমানোর এক বহুল-ব্যবহৃত ওষুধ এম্লোডিপিন। বাজারে এই ওষুধের মোটামুটি ৬১টা ব্র্যান্ড পাওয়া যায়। সব চেয়ে কমদামি ব্র্যান্ডের ৫ মিলিগ্রামের একটা বড়ির দাম ১৫ পয়সা আর সব চেয়ে বেশি দামি ব্র্যান্ডের একটা বড়ির দাম ৬ টাকা ৪০ পয়সা। যদি যে সব কোম্পানির বিক্রি এম্লোডিপিনের মোট বিক্রির ১%-এর বেশি তাদের দামের গড় করে সিলিং দাম ঠিক করা হয়, তা হলে সিলিং দাম দাঁড়াবে ৩ টাকা ৬ পয়সা, সব চেয়ে বেশি দামের ব্র্যান্ডের চেয়ে কমদামি বটে, কিন্তু সব চেয়ে কমদামি ব্র্যান্ডের তুলনায় প্রায় ২০ গুণ বেশি হবে সিলিং দাম। অন্য দিকে ১৯৯৫-এর মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে কাঁচা মাল, শ্রম, বিজ্ঞাপন, ইত্যাদির দামের ভিত্তিতে দাম ঠিক করলে তা দাঁড়ায় ১৭.৭ পয়সায়। অর্থাৎ সরকার এ ক্ষেত্রে প্রায় ১৭ গুণ বেশি অবধি দাম রাখার অনুমতি দিয়ে দিয়েছে।

রক্তে কোলেস্টেরল নামক চর্বি কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এটোরভাস্ট্যাটিন, তা অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় আছে। এর সব চেয়ে কম দামি ব্র্যান্ডের ১০টা বড়ির দাম ৯ টাকা, সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ব্র্যান্ডের ১০টা বড়ির দাম ৯৭ টাকা। অথচ তামিলনাড়ুর সরকারি সংস্থা এই ওষুধ কেনে ১০টা বড়ি ২ টাকা ১৩ পয়সায়।

রক্তে কোলেস্টেরল নামক চর্বি কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এটোরভাস্ট্যাটিন, তা অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় আছে। এর সব চেয়ে কম দামি ব্র্যান্ডের ১০টা বড়ির দাম ৯ টাকা, সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ব্র্যান্ডের ১০টা বড়ির দাম ৯৭ টাকা। অথচ তামিলনাড়ুর সরকারি সংস্থা 'তামিলনাড়ু মেডিক্যাল সার্ভিসেস কর্পোরেশন লিমিটেড' এই ওষুধ কেনে ১০টা বড়ি ২ টাকা ১৩ পয়সায়। ১৯৯৫-এর হিসেবে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করলে আজ দাম দাঁড়ায় ১০টা বড়ি ৫.৬০ টাকা। আর বর্তমান আদেশের ফর্মুলায় ১০টার সিলিং দাম হয় ৫৯.১০ টাকা।

নতুন মূল্য নিয়ন্ত্রণ হলে এমন অবস্থাই হবে ৩৪৮ টা ওষুধের দামের, অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। নিচের সারণী দেখুন —

ওষুধের নাম	কী কাজে লাগে?	২০১৩-র ওষুধ মূল্য-নিয়ন্ত্রণ নির্দেশানুযায়ী সিলিং দাম (টাকায়)	১৯৯৫-এর ওষুধ মূল্য-নিয়ন্ত্রণ নির্দেশানুযায়ী সর্বোচ্চ খুচরো দাম (টাকায়)	২০১৩ এর হিসেবে দাম/ ১৯৯৫-এর হিসেবে দাম (অনুপাত)
এটেনেলল ৫০ মিগ্রা (১৪টা বড়ির পাতা)	উচ্চ রক্তচাপ	২৮.৯৮	৩.৫	৮.২৮
এম্লোডিপিন ৫ মিগ্রা	উচ্চ রক্তচাপ	৩০.৬	১.৭৭	১৭.২৯
ডমপেরিডন ১০ মিগ্রা	বমি	২৮.৫	২.৫	১১.৪
গ্লিবেনক্ল্যামাইড ৫ মিগ্রা	ডায়াবেটিস	৯.৬	১.৪২	৬.৭৬
এনালাপ্রিল ৫ মিগ্রা	উচ্চ রক্তচাপ	২৯.৬	২.৪	১২.৩৩
সেট্রিজিন ১০ মিগ্রা	অ্যালার্জি	১৮.১	২	৯.০৫
এটরভাস্ট্যাটিন ১০ মিগ্রা	রক্তে উচ্চ কোলেস্টেরল	৫৯.১	৫.৬	১০.৫৫
এলবেন্ডাজোল ৪০০ মিগ্রা	কৃমি-সংক্রমণ	৯১.২	১২	৭.৬
ডায়াজিপাম ৫ মিগ্রা	উদ্বেগ, অনিদ্রা	১৩.২	১.৭	৭.৭৬
ফ্লুকোনাজোল ৫০ মিগ্রা	ছত্রাক-সংক্রমণ	৭৮.৩	৭৩	১০.৭৩

- এটেনেলল ছাড়া বাকিগুলো ১০টা বড়ির দাম।
- ১৯৯৫-এর হিসেবে ১০০% লাভ ধরা আছে।

ওষুধ কোম্পানি কী ভাবে ফাঁকি দেবে তার পরেও?

সাধারণত ওষুধ কোম্পানিগুলো মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশকে ফাঁকি দিতে মূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকা একটা ওষুধের সঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত একটা ওষুধের মিশ্রণ বানায়।

মনে করা যাক এটোরভাস্ট্যাটিনের সঙ্গে মেশানো হল র‍্যামিপ্রিল। র‍্যামিপ্রিল এসিই-ইনহিবিটর, উচ্চরক্তচাপ কমানোর ওষুধ। এসিই-ইনহিবিটর এনালাপ্রিল ২০১১-র তালিকায় আছে, তাই এটোরভাস্ট্যাটিনের সঙ্গে এনালাপ্রিল মেশালে মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় থাকতে হবে, র‍্যামিপ্রিল মেশালে সে ঝামেলা নেই। এ বার এনালাপ্রিলের চেয়ে র‍্যামিপ্রিল কত ভাল তার প্রচার হবে।

অথবা এটোরভাস্ট্যাটিনকে পেছনে ঠেলে সামনে আনা হবে একই ধরনের চর্বি কমানোর ওষুধ রোসুভাস্ট্যাটিন, সিমভাস্ট্যাটিন, ফ্লুভাস্ট্যাটিন, লোভাস্ট্যাটিন, পিটাভাস্ট্যাটিন ইত্যাদিকে, কেন না এরা তালিকায় নেই।

এই ফাঁকি কী ভাবে আটকানো যায়?

সরকার যদি এটোরভাস্ট্যাটিনের মতো অন্য সব স্ট্যাটিন বা এনালাপ্রিলের মতো সব এসিই-ইনহিবিটরকে অর্থাৎ একই গোষ্ঠীর সব ওষুধকে একই সিলিং-এর আওতায় নিয়ে আসেন তা হলে ফাঁকি ঠেকানো যায়।

আরেকটা উপায়—অত্যাবশ্যক ওষুধের সঙ্গে অত্যাবশ্যক নয় এমন ওষুধের মিশ্রণকে অত্যাবশ্যক ওষুধের সিলিং দামে রাখা। (অবশ্য একাধিক ওষুধের নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণগুলোর অধিকাংশই অযৌক্তিক)।

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের মত কিন্তু অন্য

তাদের মতে মূল্য নির্ধারিত হওয়া উচিত কাঁচা মালের দাম, মোড়কের দাম, উৎপাদন খরচ, মোড়ক-বন্দি করার খরচের সঙ্গে ১০০% লাভ রেখে। এমনটা করলে কিন্তু সত্যিই ওষুধের দাম কমবে। আশ্চর্য ব্যাপার হল, এখন এটোরভাস্ট্যাটিনের ক্ষেত্রে বেশি বিক্রির ব্র্যান্ডগুলোতে লাভ থাকে ৩০০০-৪৫০০%। ১০০%-এর জায়গায় সরকার যদি ১৫০% লাভ রাখতে দেয় তা হলেও ওষুধের দাম কম থাকে।

ওষুধ এমন এক পণ্য যা ক্রেতা পছন্দ করে কেনেন না, পছন্দের কাজটা করেন প্রত্যক্ষে ডাক্তার, পরোক্ষে ওষুধ কোম্পানি। অধিকাংশ সময় ক্রেতাকে চাপের মধ্যে থেকে ওষুধ কেনার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তারপর নিজ নিজ উৎপাদনের বিক্রি বাড়ানোর জন্য ওষুধ কোম্পানিগুলোর অনৈতিক কার্যকলাপ তো আছেই। নয়া অর্থনীতির প্রবক্তারা যেমন মুক্ত বাজার, স্বাধীন পছন্দের স্বপ্ন দেখান তেমন আদৌ নয় অবস্থাটা।

এমন এক অবস্থা যেখানে ক্রেতা আগে থেকেই বৈষম্যের শিকার, সেখানে প্রস্তাবিত মূল্য নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতিটাকে আরও ক্রেতার বিরুদ্ধে ঠেলে দেবে।

আমাদের দাবি

আমরা অবশ্যই মূল্য নিয়ন্ত্রণ চাই তবে তা মন্ত্রিগোষ্ঠীর প্রস্তাবিত মূল্য নিয়ন্ত্রণ নয়।

১। ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করা হোক কাঁচা মালের দাম, উৎপাদন খরচ, ইত্যাদি বিচার করে।

২। ওষুধ কোম্পানি যাতে ফাঁকি দিতে না পারে তাই নিষিদ্ধ করা হোক সমস্ত অযৌক্তিক নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণ। ওষুধ বিজ্ঞানের পাঠ্য বইয়ে বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বা জাতীয় অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় যাদের উল্লেখ নেই এমন সব মিশ্রণ ওষুধ বাজার থেকে দূর করা হোক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এস শ্রীনিবাসন, LOCOST, বরোদা।

লেখক পরিচিতি : ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এম বি বি এস, জেনেরাল ফিজিসিয়ান, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের এক কর্মী।

ADVERTISEMENT

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস
সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র
পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে
গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)
আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন
যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

ADVERTISEMENT

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।

অথবা ফোন করুন ০৮৪২০০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩২৫৪৩৭৫৬০।

উচ্চ রক্তচাপ

আজ থেকে ষাট বছর আগে আমাদের দেশে একশ জনের মধ্যে মাত্র দু'জন মানুষ উচ্চ রক্তচাপে ভুগতেন, আজ ভোগেন শতকরা কুড়ি জন। 'নিঃশব্দ ঘাতক' এই মহামারী হৃদ্‌পিণ্ড, কিডনি ও চোখের সমূহ ক্ষতি করে; বিশ্বের মোট মৃত্যুর ১৩ শতাংশের কারণ হল উচ্চ রক্তচাপ। অথচ এ দেশে রোগীদের মধ্যে মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ এর উপযুক্ত চিকিৎসা করান। কেন এই মহামারী? একে কি ঠেকানো সম্ভব? প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরটাও প্রায় জানা,

লিখছেন **ডা. সূর্য্যেন্দুবিকাশ খাটুয়া**

স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতবর্ষে মৃত্যুর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে জীবাণুঘটিত রোগ, দুর্ভিক্ষ, অপুষ্টি এগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গত ছয় দশকে এই প্রবণতার পরিবর্তন হচ্ছে। সারা বিশ্বে এখন অসংক্রামক রোগই (Non-communicable disease) যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যানসার মৃত্যুর প্রধান কারণ (প্রায় ৬৩ শতাংশ)। যার মধ্যে ৪৮ শতাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ হৃদ্‌পিণ্ড ও রক্তনালী সংক্রান্ত রোগ (কার্ডিওভাসকুলার ডিসিসেস), যা প্রধানত ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের কারণে হয়। এই প্রবণতা মূলত শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন বিশ্বায়নের সৌজন্যে আমাদের খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রান্তিক গ্রামগুলিতে আমরা নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজে নাও পেতে পারি, কিন্তু চিপ্‌স, ঠান্ডা পানীয়, প্রক্রিয়াজাত খাবার পাব। ছোট বাচ্চাদের এখন আমরা চকোলেট (ক্যাডবেরি), ঠান্ডা পানীয়, চিপস—এগুলোই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খেতে দেখি। খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার এই 'বৈপ্লবিক' পরিবর্তন ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে এক মহামারীর জন্ম দিয়েছে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো ছিল (যক্ষ্মা, ডায়ারিয়া, নিউমোনিয়া ইত্যাদি) তা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করার আগেই এখন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা—এই অসংক্রামক রোগগুলো ও জীবাণুঘটিত নয় এমন সব রোগ যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যানসার ইত্যাদি। ছয় দশক আগে উচ্চ রক্তচাপ ভারতের গ্রামাঞ্চলে এবং শহরে মাত্র ২ শতাংশ লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তা বেড়ে যথাক্রমে ১৫ ও ২৫ শতাংশ। সারা বিশ্বে যত জন মানুষ এখন মারা যান, তার ১৩ শতাংশ ক্ষেত্রে কারণ উচ্চ রক্তচাপ।

উচ্চ রক্তচাপ কী?

আমাদের শরীরে অবিরত রক্ত প্রবাহের একটি জটিল প্রক্রিয়া আছে। এই রক্ত প্রবাহ চালু রাখার মধ্যমণি হল হৃদ্‌পিণ্ড। হৃদ্‌পিণ্ডের প্রতিবার সংকোচনের ফলে বাম নিলয় থেকে রক্ত মহাধমনী দিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং কোষের জন্য পুষ্টি, অক্সিজেন আর প্রয়োজনীয় উপাদান পৌঁছে দেয়। হৃদ্‌পিণ্ডের প্রসারণ বা ডায়াস্টোলের সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডে ফিরে আসে। রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় ধমনীর গায়ে যে পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে তাকে রক্তচাপ বলা হয়। হৃদ্‌পিণ্ড সংকুচিত হলে রক্ত ধমনীতে বেশি করে ঢোকে, ফলে ধমনীর মধ্যে রক্তচাপ বাড়ে—এটাকে বলা হয় সিস্টোলিক রক্তচাপ। আবার যখন হৃদ্‌পিণ্ড প্রসারিত হয়, তখন রক্তচাপ কমে যায় —এটাকে বলা হয় ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ। যেমন একজনের রক্তচাপ ১২০/৭০ মিমি পারদ, এখানে ১২০ সিস্টোলিক এবং ৭০ ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ।

বয়স এবং লিঙ্গভেদে রক্তচাপের তারতম্য হয়, আবার একই মানুষের বিভিন্ন সময়ে রক্তচাপ বিভিন্ন হতে পারে। উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা, অধিক পরিশ্রম, ব্যায়ামের ফলে সাময়িকভাবে রক্তচাপ বাড়তে পারে, কিন্তু ঘুমের সময় বা বিশ্রাম নিলে রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়ে যায়। রক্ত চাপের এই পরিবর্তন স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে পড়ে। কিছু ক্ষেত্রে রোগীর রক্তচাপ ডাক্তারের চেম্বারে বেশি থাকে, কিন্তু ঘরের শান্ত পরিবেশে বা বিশ্রাম নিলে কমে স্বাভাবিক মাত্রার মধ্যে চলে আসে, একে 'হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন' বলে। এই সব মানুষের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ-এর পরে উচ্চ রক্তচাপের রোগী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি কারও রক্তচাপ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি হয় এবং অধিকাংশ সময়, এমনকী বিশ্রামকালীন সময়েও বেশি থাকে, তবে ধরে নিতে হবে তিনি উচ্চ রক্তচাপের রোগী।

রক্তচাপ কত বেশি হলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলা হবে, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ২০০৩ সালে উচ্চ রক্তচাপ নির্ণয়, মূল্যায়ন এবং চিকিৎসার ওপর মার্কিন জয়েন্ট ন্যাশনাল কমিটির ৭ম রিপোর্টে উচ্চ রক্তচাপের পর্যায় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই রিপোর্ট অনুসারে —

	সিস্টোলিক		ডায়াস্টোলিক
স্বাভাবিক রক্তচাপ	১২০ এর কম	এবং	৮০ এর কম
প্রাক্ উচ্চ রক্তচাপ (Pre-hypertension)	১২০-১৩৯	অথবা	৮০-৮৯
উচ্চ রক্তচাপ			
পর্যায় -১	১৪০-১৫৯	অথবা	৯০-৯৯
পর্যায় -২	১৬০-এর বেশি	অথবা	১০০ এর বেশি

(এই শ্রেণিবিন্যাস ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সের জন্য প্রযোজ্য)

উচ্চ রক্তচাপ নির্ণয় করার সময় শান্ত পরিবেশে কমপক্ষে দুই'বার এবং

দুই হাতে রক্তচাপ মাপা জরুরি।

যাঁদের উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, তাঁদের প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে এক জন এর জন্য চিকিৎসা করান এবং মাত্র ৫ শতাংশ রোগীর রক্তচাপ সুনিয়ন্ত্রিত থাকে। ভারতবর্ষে মাত্র ১/৩ থেকে ১/৪ ভাগ মানুষ উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কে সচেতন।

উচ্চ রক্তচাপের কারণ

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রায় ৯০ শতাংশ রোগীর উচ্চ রক্তচাপের কারণ জানা যায় না, বাকি ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে হরমোন বা কিডনির অসুখ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি উচ্চ রক্তচাপের কারণ। ছোটদের বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের কারণগুলো হল—জেনেটিক রোগ, কিডনির অসুখ, অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির (কিডনির ওপরে অবস্থিত) সমস্যা, হৃদপিন্ডের মহাধমনীর স্থায়ী সংকোচন (যাকে কোয়ার্কটেশন অফ্ অ্যায়োর্ট বলা হয়) ইত্যাদি।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে এত ভাবার কারণ

উচ্চ রক্তচাপের প্রাথমিক কোনও লক্ষণ নেই। বেশীর ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ নীরবে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মারাত্মক ক্ষতি করে চলে এবং তারপরে তা চিকিৎসকের নজরে আসে। কিছু ক্ষেত্রে, উচ্চ রক্তচাপের রোগীর লক্ষণ থাকতে পারে, যেমন—মাথাব্যথা, ঘাড়ব্যথা, চোখে দেখতে অসুবিধা হওয়া, ঘুম না হওয়া ইত্যাদি। অবশ্য এই লক্ষণগুলো থাকলেই তা সবসময় উচ্চ রক্তচাপের কারণে নাও হতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপের জটিলতা

আমাদের শরীরের মূলত চারটি অঙ্গ উচ্চ রক্তচাপের ফলে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১। হৃদ্‌পিণ্ড - হৃদ্‌পিণ্ডের মাংসপেশী দুর্বল হয়ে হার্ট ফেলিওর কিংবা হৃদ্‌পিণ্ডের রক্তনালী সংকুচিত বা বন্ধ হয়ে হার্ট অ্যাটাক (Infarction) হতে পারে।

যাঁরা সারাক্ষণ বসে কাজ করেন, কায়িক পরিশ্রম করেন না বা শরীরচর্চা করেন না, তাঁদের দেহে মেদ জমে ওজন বেড়ে যায়। এই মেদ রক্তনালীর গায়ে পলির মতো জমে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। এর ফলে উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসের মতো সমস্যা দেখা দেয়।

২। মস্তিষ্ক - উচ্চ রক্তচাপের কারণে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে বা রক্তপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে স্ট্রোক হতে পারে।

৩। কিডনি - উচ্চ রক্তচাপের ফলে কিডনি ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে যায় এবং আমাদের শরীরে দূষিত পদার্থ জমতে থাকে। যখন কিডনি একেবারে অকেজো হয়ে যায় তখন ডায়ালিসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপন করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না।

৪। চোখ - রেটিনায় রক্তক্ষরণ হয়ে রোগী অন্ধ হয়ে যেতে পারেন।

উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ার কারণ

এগুলোকে দুই'ভাগে ভাগ করা যায়—

১। যেগুলো আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না—

- **বয়স :** বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা কমে যায়, তাই রক্ত চাপ বাড়ে। ভারতবর্ষে ৩০ বছর বা তার কম বয়স্কদের ক্ষেত্রে মাত্র ১৩ শতাংশ এবং ৬০ বছর বা তার বেশি বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষের উচ্চ রক্তচাপ পাওয়া যায়।
- **জাতিগত :** সাদা চামড়ার মানুষের তুলনায় বাদামি / পীত / কালো চামড়ার মানুষদের উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- **বংশের ইতিহাস :** বাবা-মা কাকা, ঠাকুরদা বা ভাই বোনের উচ্চ রক্তচাপ থাকলে উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

২। যেগুলো আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি (জীবনযাত্রা এবং খাদ্যাভ্যাস সংক্রান্ত)

- **অধিক ওজন এবং অলস জীবনযাপন** - যাঁরা সারাক্ষণ বসে কাজ করেন, কায়িক পরিশ্রম করেন না বা শরীরচর্চা করেন না, তাদের দেহে মেদ জমে ওজন বেড়ে যায়। এই মেদ রক্তনালীর গায়ে পলির মতো জমে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। এর ফলে উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসের মতো সমস্যা দেখা দেয়।
- **খাদ্যাভ্যাস :** অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাবার- মাংস, মাখন, বেশি খেলে শরীরে মেদ জমে। এ ছাড়া, প্রক্রিয়াজাত খাবার (বিস্কুট, কেক, পেস্ট্রি, চিপস, চকোলেট), ঠাণ্ডা পানীয় যেগুলোর পুষ্টিগুণ খুব কম এবং সুষম খাবার নয়, তা খেলে শরীরে মেদ জমে। এর ফলে রক্তনালীতে রক্ত প্রবাহের পথ সরু ও শক্ত হয়ে যায় এবং উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি হয়।

ভারতবর্ষে ডায়ারিয়া, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়ার পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ক্যানসার ইত্যাদি বেড়ে চলেছে। জীবাণুঘটিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করার পরিকাঠামো যেখানে অপ্রতুল, সেখানে এই সব নতুন রোগ সমস্যাকে গভীর এবং সংকটজনক করে তুলেছে।

অতিরিক্ত লবণ (কাঁচা নুন কিংবা অধিক নুন দেওয়া খাবার) খেলে উচ্চ রক্তচাপের সম্ভাবনা থাকে। লবণে সোডিয়াম থাকে যা রক্তনালীর স্থিতিস্থাপকতার স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। এছাড়া অতিরিক্ত সোডিয়াম রক্তে জলীয় অংশ বাড়িয়ে দেয়। এগুলোর ফলে রক্তচাপ বেড়ে যায়। কিছু প্রক্রিয়াজাত খাবারে লবণ বেশি থাকে—সস, বেকারিজাত খাবার (কেক, পেস্ট্রি, চিপস), মাখন, মাংসজাত খাদ্য, সামুদ্রিক খাবার ইত্যাদি।

পটাসিয়াম যুক্ত খাবার (যেমন ফল, শাক-সব্জি, ডাবের জল, শশা) একেবারে না খেলে বা কম খেলে রক্তচাপ বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।

- **তামাকজাত দ্রব্য—** বিড়ি, সিগারেট, গুটখা, খৈনি এগুলোর মধ্যে নিকোটিন এবং অন্যান্য যে সব পদার্থ থাকে, তা আমাদের শরীরে হরমোনের তারতম্য ঘটায়, রক্তনালীর দেওয়ালকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ফলে উচ্চ রক্তচাপের সম্ভাবনা অনেক গুণ বেড়ে যায়।

  অতিরিক্ত মদ্যপান করলে যকৃৎ এবং শরীরে অন্যান্য অঙ্গে মেদ জমে, একই ভাবে রক্তনালীর দেওয়ালে চর্বি জমে হৃদ্‌পিণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে রক্তচাপ বাড়ে।
- দীর্ঘদিন দুশ্চিন্তা, উত্তেজনা, উদ্বেগ, যা আমাদের এখনকার প্রতিযোগিতামূলক জীবনে নিত্যসঙ্গী —এর ফলে রক্তচাপ বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ডায়াবেটিস-এর রোগীদের উচ্চ রক্তচাপের সম্ভাবনা বেশি। তাই রক্তে সুগারের পরিমাণ জীবনযাত্রার অভ্যাস বদলে বা প্রয়োজনে ওষুধ খেয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত।

উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে অধিক শর্করা, এবং রক্তে অধিক ফ্যাট নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত।

চিকিৎসা :

সাধারণ মানুষ বা যাঁরা প্রাক্ উচ্চ রক্তচাপ-এর সীমায় আছেন, তাঁরা নিম্নলিখিত উপায়গুলো অবলম্বন করলে উচ্চ রক্তচাপের আধিক্য কমানো যেতে পারে।

- **অতিরিক্ত ওজন কমানো** — প্রতিদিন অন্ততঃ ৩০ মিনিট হাঁটা, ব্যায়াম করা, সাইকেল চালানো কিংবা সাঁতার কাটা উচিত। লিফটের বদলে সিঁড়ি ব্যবহার করুন, কাজের জায়গায় হেঁটে বা সাইকেলে যান।
- **সুস্থ খাদ্যাভ্যাস** — পরিমিত পরিমাণে সুষম খাবার খেতে হবে। প্রক্রিয়াজাত খাবার, অতিরিক্ত লবণ দেওয়া খাবার, ঠাণ্ডা পানীয়, ফাস্ট ফুড বর্জন করা উচিত। অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাবার কমিয়ে শাক-সব্জি, ফলমূল, স্যালাড খেতে হবে। ননী-ছাড়া দুধ, গাঢ় রঙের শাকসব্জি যথাক্রমে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম-এর উৎস। এগুলো রক্তচাপের ভারসাম্য রক্ষা করে।
- **লবণ খাওয়া কমান—** সমীক্ষায় দেখা গেছে, সারা বিশ্বে মানুষ প্রতিদিন প্রায় ৯-১২ গ্রাম লবণ খান, যা প্রয়োজনের তুলনায় ১০-১২ গুণ বেশি। প্রতিদিন ১ চা-চামচ-এর বেশি লবণ খাওয়া উচিত নয়। এজন্য খাবারে কাঁচা লবণ এবং অতিরিক্ত লবণ দেওয়া খাবার (মাখন, সস, কেক, পেস্ট্রি, চিপস্ ইত্যাদি) বর্জন করতে হবে, রান্না করার সময়ে অল্প লবণ ব্যবহার করার অভ্যাস করতে হবে। দেখা গেছে, লবণ খাওয়ার পরিমাণ অর্ধেক করে দিতে পারলে, সারা বিশ্বে বছরে হৃদ্‌পিন্ড, মস্তিষ্ক এবং কিডনির অসুখ জনিত রোগে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ২৫ লাখ কমানো যাবে।
- তামাকজাত দ্রব্য (বিড়ি, সিগারেট, খৈনি, গুটখা), অ্যালকোহল ত্যাগ করুন।
- দুশ্চিন্তা পরিহার করুন, শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করার চেষ্টা করুন।

যাঁরা উচ্চ রক্তচাপ-এর রোগী (রক্তচাপ ১৪০-এর বেশি) তাঁদের প্রথম দিকে জীবনযাত্রা এবং খাদ্যের অভ্যাস পাল্টানোর পাশাপাশি ডাই-ইউরেটিকস জাতীয় ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এতে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে অন্যান্য শ্রেণির ওষুধ (যেমন, বিটা ব্লকার, এ.সি.ই.

উচ্চ রক্তচাপের প্রাথমিক কোনও লক্ষণ নেই। বেশীর ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ নীরবে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মারাত্মক ক্ষতি করে চলে এবং তারপরে তা চিকিৎসকের নজরে আসে। কিছু ক্ষেত্রে, উচ্চ রক্তচাপের রোগীর লক্ষণ থাকতে পারে, যেমন—মাথাব্যথা, ঘাড়ব্যথা, চোখে দেখতে অসুবিধা হওয়া, ঘুম না হওয়া ইত্যাদি।

ইনহিবিটার, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, ভ্যাসোডাইলেটর, ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়। বেশির ভাগ উচ্চ রক্তচাপের রোগীর রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে দুই বা ততোধিক শ্রেণির ওষুধের প্রয়োজন হয়।

• ভারতবর্ষে সমস্যা কতটা ব্যাপক?

বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশ ভারতবর্ষ ২০২৪ সালে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হতে চলেছে। ভারতবর্ষে ডায়ারিয়া, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়ার পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ক্যানসার ইত্যাদি বেড়ে চলেছে। জীবাণুঘটিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো যেখানে অপ্রতুল, সেখানে এই সব নতুন রোগ সমস্যাকে গভীর এবং সংকটজনক করে তুলেছে।

২০০৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতবর্ষে ২৫ বছর বা তার বেশি বয়স্কদের মধ্যে প্রায় ২২-২৩ শতাংশ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের গ্রামও খুব পিছিয়ে নেই, সৌজন্যে বিশ্বায়ন-পরবর্তী জীবনযাত্রা এবং খাদ্যাভ্যাসের আমূল পরিবর্তন। মধ্যভারতের এক শহরে সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ৩২% মানুষ প্রাক্ উচ্চ রক্তচাপের সীমানায় আছেন। দিল্লী ও চেন্নাইতে এই অনুপাত হল যথাক্রমে ৪৪ ও ৩৬%।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার স্তরে উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা, এটা কীভাবে কমানো যায়, এর ক্ষতিকর দিকগুলো আলোচনা করা, তামাক, অ্যালকোহল বর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি করা যায়। এ ছাড়াও, উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা প্রাথমিক স্তরের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় করা সম্ভব। আমাদের এই দুর্বল প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এগুলো অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

ভারতবর্ষে উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের মধ্যে শহরে ৫০ শতাংশ এবং গ্রামে ২৫ শতাংশ রোগী জানেন, তাঁর উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে। যাঁদের উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, তাঁদের প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে এক জন এর জন্য চিকিৎসা করান এবং মাত্র ৫ শতাংশ রোগীর রক্তচাপ সুনিয়ন্ত্রিত থাকে। ভারতবর্ষে মাত্র ১/৩ থেকে ১/৪ ভাগ মানুষ উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কে সচেতন।

কী করবেন?

নিম্নলিখিত সতর্কতাগুলো অবলম্বন করুন এবং চেষ্টা করুন যাতে উচ্চ রক্তচাপ ঠেকানো যায়—

- ৩০ বা তার বেশি বয়স্কদের নির্দিষ্ট সময় রক্তচাপ পরীক্ষা করানো এবং প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী রক্তে শর্করা এবং ফ্যাটের পরিমাণ পরীক্ষা করা।
- যাঁরা উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ খাচ্ছেন, তা নিয়মিত খাওয়া, হঠাৎ করে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া বন্ধ না করে দেওয়া।
- ওষুধ গ্রহণ করা হচ্ছে এমন অবস্থায় অন্তত প্রতি মাসে একবার রক্তচাপ পরীক্ষা করানো।
- যাঁরা দীর্ঘদিন উচ্চ রক্তচাপের রোগী তাঁদের বছরে অন্তত একবার হার্টের ও কিডনীর পরীক্ষা করা উচিত।
- উচ্চ রক্তচাপের রোগীর একজন চিকিৎসকের অধীনে থাকা এবং তাঁর নিয়মিত পরামর্শ অনুযায়ী চলা উচিত।
- আলগা লবণ, ফাস্ট ফুড, চর্বি জাতীয় খাবার, প্যাকেট করা খাবার বর্জন করা এবং নিয়মিত অন্তত ৩০ মিনিট শরীর চর্চা করা, তামাক জাত দ্রব্য, অ্যালকোহল বন্ধ করা উচিত।

লেখক পরিচিতি : ডা. সূর্য্যেন্দুবিকাশ খাটুয়া, এম বি বি এস, উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হাওড়ার শ্রমজীবী মানুষের জন্য গড়া একটি ক্লিনিকে যুক্ত।

রূপান্তর বিকার

(Conversion Disorder)

হঠাৎ করে চোখে দেখতে পাচ্ছে না বা কথা বলতে পারছে না, কিংবা মৃগীরোগীর মতো খিঁচুনি হচ্ছে। বাড়ির লোক ভেবে ভেবে একসা, চিকিৎসকও কূলকিনারা পাচ্ছেন না। আসলে এ হল মনের গহিন রহস্যের খেলা—লিখছেন **ডা. সুমিত দাশ।**

চেম্বারে বসে আছি। একটা ১৫-১৬ বছরের মেয়েকে প্রায় কোলে করে নিয়ে ঢুকল তার বাবা। পেছনে আরও চার-পাঁচজন। সবাই মিলে চিৎকার করে বোঝাতে চাইছে মেয়েটির কী হয়েছে এবং সেই অসুস্থতাটা কত ভয়ঙ্কর। ধমক-ধামক দিয়ে সবাইকে থামিয়ে বাবাকে বলতে বললাম। যেটা উদ্ধার করা গেল, মেয়েটির ডানদিক হঠাৎ করে প্যারালিসিস হয়ে গেছে। ডান হাত-ডান পা নাড়তে পারছে না। কিন্তু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা গেল, এরকম প্যারালিসিসে আর যে সব লক্ষণ থাকার কথা সেগুলো নেই। এ বার বাড়ির অন্য লোকদের বের করে দিয়ে মেয়েটির সঙ্গে আলাদা কথা বললাম। জানা গেল সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার প্রস্তুতি খুব ভালো হয়নি। এর মধ্যে মোবাইল নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার জন্য সকালে বাবা ভীষণ বকাবকি করেছেন এবং মোবাইল কেড়ে নিয়েছেন—তারপর তার এই রোগ হয়েছে। এই রোগকে 'রূপান্তর বিকার' বা কনভার্সান ডিসঅর্ডার (Conversion Disorder) বলা হয়।

কনভার্সান ডিসঅর্ডার ও হিস্টিরিয়া ঃ

বহু দিন আগে প্রথম যখন এই রোগটি ডাক্তারদের নজরে এল, তখন দেখা গেল রোগটি কেবলমাত্র মেয়েদের মধ্যে হয়। মেয়েদের দেহে 'ইউটেরাস' কথাটা 'হিস্টেরাস' থেকে এসেছে, সেই ইউটেরাস এই রোগের কারণ বলে ভাবা হ'ত। তাই এই রোগের আগের নাম ছিল হিস্টেরিয়া। প্রকৃতপক্ষে ভাবা হ'ত ইউটেরাসটি চলমান—যখন যে অঙ্গে সেটি যায়—হাতে, পায়ে, মাথায়, বুকে সেই অঙ্গেই এই রোগ আক্রমণ করত—এরকম মনে করা হ'ত। পরে দেখা গেল রোগটি ছেলেদেরও হচ্ছে—যাদের ইউটেরাস নেই। তখন রোগটি সম্পর্কে নতুন করে অনুসন্ধান করা হ'ল। কারণ ভাবা হ'ল। নামও পাল্টে গেল। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলে নেওয়া যাক— 'মাস হিস্টিরিয়া' বা গণহিস্টিরিয়া, যখন অনেক মানুষ এক সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রভাবিত হয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করেন। সেটা ধর্মীয় কারণে হতে পারে, কোন কল্পিত রোগের আতঙ্কে হতে পারে যেমন হয়েছিল কয়েক বছর আগে 'লিঙ্গ' ছোট হয়ে যাওয়ার আতঙ্ক। কিন্তু 'মাস হিস্টিরিয়া' বলে কোন ডাক্তারি পরিভাষা বা রোগ নেই। বরং এগুলোকে বিশেষ ধরনের সমস্যা যাকে 'কালচার বাউন্ড সিনড্রোম' বলা হয়, তার মধ্যে রাখা যেতে পারে। এ বিষয়ে অন্য কোনও সময় আলোচনা করা যাবে।

কী হয় এই রোগে

রূপান্তর বা কনভার্সান এই নামটা দেওয়ার পেছনে একটি যুক্তি আছে। ধরা হয়, উদ্বেগজনিত মানসিক শক্তি পরিবর্তিত হয়ে বা রূপ বদলে শারীরিক উপসর্গে পরিণত হয়েছে —তাই এ'রকম নাম দেওয়া হয়েছে।

এই রোগের উপসর্গ হঠাৎ আসে এবং দেখলে মনে হয় কোনও একটি শারীরিক রোগের সঙ্গে মিল আছে। কিন্তু ভাল করে পরীক্ষা করলে এবং রোগের ইতিহাস নিলে দেখা যায় যে রোগীর মানসিক দ্বন্দ্বই এর মূল কারণ।

এই রোগ প্রচুর মানুষের হয়। বিভিন্ন সমীক্ষা বলছে 'কনভার্সান ডিসঅর্ডার' প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষের জীবনে কোনও না কোনও সময় হতে পারে। দেখা গেছে যে কোনও মানসিক রোগের হাসপাতালে শতকরা ৫-১৫ ভাগ রোগী এই রোগ নিয়ে ভর্তি হয়। রোগটি মেয়েদের মধ্যে বেশি হয়। মহিলা-পুরুষের অনুপাত ২ঃ১ থেকে ১০ঃ১ পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। সাধারণত শেষ শৈশব থেকে প্রথম যৌবনে রোগটি বেশি হয়। গ্রামের মানুষ, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ, কম শিক্ষিত মানুষদের এই রোগ বেশি হয়।

রোগ লক্ষণ

হঠাৎ পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস হয়ে যাওয়া, অন্ধ হয়ে যাওয়া এবং বোবা হয়ে যাওয়া উপসর্গগুলির মধ্যে সব থেকে বেশি দেখা যায়, এ ছাড়া শরীরের কোনও জায়গা অবশ হয়ে যাওয়া, উদ্ভট ভঙ্গিতে হাঁটাচলা করার মতো কিছু উপসর্গও দেখা যায়। অনেকের মৃগী রোগের মতো লক্ষণ হয়। অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকে, দাঁতে দাঁত লেগে যায়। জিভ কেটে ফেলা, প্রস্রাব করে ফেলা, পড়ে যাওয়া—এগুলো সাধারণত হয় না, তবে অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে এই উপসর্গগুলোও হ'তে পারে। সত্যিকারের মৃগী রোগে এসব হয়। তবে সব ক্ষেত্রেই ভালভাবে ইতিহাস নিলে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যায় রোগের উপসর্গ এবং প্রকৃত রোগের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে; এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই

মানসিক দ্বন্দ্ব জড়িত থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেতে এবং পরিবারের অন্য মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেই এই রোগ- লক্ষণগুলি রোগীর মধ্যে ফুটে ওঠে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা উচিত—রোগী কিন্তু কখনওই ইচ্ছা করে এই উপসর্গ নিজের দেহে তৈরি করে না। অর্থাৎ রোগী রোগের ভান করে না, বা বদমায়েশি করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই রোগের সঙ্গে উদ্বেগ-রোগ বা অবসাদ-রোগ জড়িত থাকে।

রোগের ভবিষ্যৎ ও চিকিৎসা ঃ

সাধারণত রোগ হঠাৎ শুরু হয় এবং শতকরা পঁচানব্বই ভাগ রোগ দু'সপ্তাহের মধ্যে নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যায়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগের ভবিষ্যৎ খারাপ হয়। সাধারণত এক চতুর্থাংশ থেকে এক পঞ্চমাংশ রোগীর এক বছরের মধ্যে রোগের পুনরাক্রমণ হয়। দেখা গেছে প্যারালিসিস, বোবা হয়ে যাওয়া এবং হঠাৎ অন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো উপসর্গ নিয়ে আসা রোগীদের ভবিষ্যৎ ভাল হয়। এবং মৃগী রোগের মতো বা কাঁপুনি রোগের মতো রোগীদের ভবিষ্যৎ ভাল নয়। রোগের চিকিৎসা করা হয় মনশ্চিকিৎসা এবং ওষুধ দিয়ে।

সব শেষে যেটা আবার বলার—এই রোগ রোগীর কাছে কিন্তু সত্যিকারের রোগ। সে ভান করে না। তাই রোগীকে উপহাস করা বা রোগের উপসর্গ নিয়ে উত্যক্ত করা একেবারেই উচিত নয়। আর একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, এই ধরনের রোগের উপসর্গ নিয়ে আসা রোগীকে যদি সত্যিকারের শরীরের রোগ ভেবে চিকিৎসা করা হয়—সেটা ভুল চিকিৎসা। তবে সেই চিকিৎসার আর্থিক ক্ষতি ছাড়া অন্য ক্ষতি মারাত্মক নয়। কিন্তু সত্যিকারের শারীরিক রোগকে 'কনভার্সান ডিসঅর্ডার' ধরে চিকিৎসা করা রোগীর পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারদেরও এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

এই রোগ রোগীর কাছে কিন্তু সত্যিকারের রোগ। সে ভান করে না। তাই রোগীকে উপহাস করা বা রোগের উপসর্গ নিয়ে উত্যক্ত করা একেবারেই উচিত নয়।

লেখক পরিচিতি : ডা. সুমিত দাশ, এম বি বি এস, ডিপিএম, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ।

ADVERTISEMENT

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ ও সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার-এর যৌথ উদ্যোগে কেনা হল একটি মোটর চালিত নৌকা।

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে রোগী পরিবহন ও মেডিকেল টিমের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হবে এই যানটি।

এই নৌকাটি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন দেশ বিদেশে থাকা শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের বন্ধুরা।

ট্যুরিস্ট সিজনে নৌকাটিকে ভাড়া দিয়ে উপার্জিত অর্থে সুন্দরবন সীমান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ চালানো হবে।

কম খরচে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন—

সম্পাদক, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ,

ফোন : ৯৮৩০৯২২১৯৪

উৎপল মণ্ডল, সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার, ফোন : ৯০৮৮০৫০৫২৫

যক্ষ্মারোগকে জানা-বোঝা

টিবি তথা যক্ষ্মারোগ আমাদের দেশে তো বটেই, এমনকী উন্নত দেশেও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ রোগ চিকিৎসায় সারে, শুধু ওষুধগুলো ঠিকঠাক খেয়ে যেতে হবে, আর যক্ষ্মারোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা সকলকে পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা থাকতে হবে—লিখছেন **ডা. বিশ্বজিত চক্রবর্তী।**

যক্ষ্মারোগটা কী?

'মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকুলোসিস' নামের এক ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণে হওয়া রোগ যক্ষ্মা বা টিউবারকুলোসিস (টিবি—TB)। সাধারণত ফুসফুস এ রোগে আক্রান্ত হলেও মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড, হৃদপিণ্ড, কিডনি, ইত্যাদি যে কোনও অঙ্গতন্ত্রই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

যদি রোগী নিয়মিত পুরো সময় ধরে তাঁদের দেওয়া ওষুধ নিয়ে খেয়ে যান, তা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যক্ষ্মা পুরোপুরি সেরে যায়।

কতটা ভয়ানক যক্ষ্মার সমস্যা?

- বর্তমানে পৃথিবীর ২০০ কোটি মানুষ অর্থাৎ পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যক্ষ্মার জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত।
- শ্বাসের সঙ্গে 'মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকুলোসিস' জীবাণু ফুসফুসে নিয়ে মানুষ যক্ষ্মা জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হন। সংক্রামিত হওয়া মানেই কিন্তু যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়া নয়। বেশির ভাগ যক্ষ্মা জীবাণু-সংক্রামিত মানুষ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন না। যক্ষ্মার জীবাণু তাঁদের ফুসফুস বা অন্যান্য অঙ্গে সুপ্ত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ ঘুমিয়ে থাকে। মানুষটির রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতা জীবাণুগুলোকে রোগ ঘটাতে বাধা দেয়। এই অবস্থাটাকে বলে 'লেটেন্ট টিউবারকুলোসিস'।
- সুপ্ত অবস্থা থেকে 'মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকুলোসিস' যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন মানুষটি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হন। এ যেন জীবাণুর ঘুম ভাঙা। সাধারণত এমনটা হয় মানুষটির রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে।
- ২০১০-এ সারা পৃথিবীতে ৮৮ লক্ষ মানুষ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন আর মারা গিয়েছিলেন ১৪ লক্ষ।

কখন কারও যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে? কখন সুপ্ত যক্ষ্মাজীবাণু সক্রিয় হয়ে ওঠে?

- যদি মানুষটির এমন রোগ থাকে যেগুলোতে রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা কমে যায়। যেমন—ডায়াবেটিস মেলিটাস, কিডনির দীর্ঘস্থায়ী রোগ।
- যদি অপারেশন করে মানুষটির পাকস্থলী বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। যদি তাঁর 'সিলিয়াক ডিজিজ' (Coeliac disease)-এর মতো পরিপাকতন্ত্রের রোগ থাকে।
- যদি তিনি স্টেরয়েড-এর মতো এমন কোনও ওষুধ দীর্ঘ দিন নেন, যেগুলোতে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে।
- অপুষ্টি, ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি, কম ওজন।
- এইচ আই ভি সংক্রমণ
- খারাপ অবস্থায় বসবাস
- ধূমপান
- বেশিমাত্রায় মদ্যপান
- বিশেষ কিছু ধরনের ক্যানসার, যেমন মাথা ও গলার ক্যানসার, রক্তের ক্যানসার।
- সিলিকোসিস (পেশাগত শ্বাসরোগ যা শ্বাসের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে সিলিকার ধুলো ফুসফুসে ঢোকার ফলে হয়)।

কী কী উপসর্গ থাকলে যক্ষ্মারোগ সন্দেহ করবেন?

যদিও যক্ষ্মা শরীরের যে কোনও অঙ্গকে আক্রমণ করতে পারে, তবু সাধারণত আক্রান্ত হয় ফুসফুস। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস যক্ষ্মার উপসর্গগুলো চলতে পারে। এগুলোর মধ্যে আছে :

- জ্বর (অজানা কারণে জ্বর হতে থাকলে সম্ভাব্য কারণগুলোর মধ্যে যক্ষ্মা থাকা উচিত)
- ওজন কমতে থাকা, খিদে কমে যাওয়া

বেশির ভাগ যক্ষ্মা জীবাণু-সংক্রামিত মানুষ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন না। যক্ষ্মার জীবাণু তাঁদের ফুসফুস বা অন্যান্য অঙ্গে সুপ্ত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ ঘুমিয়ে থাকে। মানুষটির রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতা জীবাণুগুলোকে রোগ ঘটাতে বাধা দেয়।

রোগীর থেকে এঁদের মধ্যে জীবাণু ছড়িয়ে থাকতে পারে। আবার উল্টোটাও হতে পারে—এঁদের কারও থেকে রোগীর সংক্রমণ হয়ে থাকতে পারে।

- রাতে হাল্কা জ্বর, যা ঘাম দিয়ে ছাড়ে
- শ্বাসকষ্ট আর পা (গোড়ালির কাছে) ফোলা
- গলায় বা অন্যত্র গ্ল্যান্ড ফোলা
- কাশি—শুকনো কাশি হতে পারে, কাশির সঙ্গে কফ উঠতে পারে, কফে রক্ত থাকতে পারে।
- বুকে ব্যথা
- ক্লান্তি, শক্তির অভাব
- মাথা-ব্যথা, বিভ্রান্তি, খিঁচুনি (যদি যক্ষ্মা মস্তিষ্ক বা তার আবরণীকে আক্রমণ করে)
- গিলতে ও কথা বলতে অসুবিধা (যদি যক্ষ্মা রোগীর স্বর-যন্ত্র অর্থাৎ larynx-কে আক্রমণ করে)।
- পেটে জল জমে ফুলে যাওয়া (এর ডাক্তারি নাম ascites)

যক্ষ্মা রোগীদের কারও কারও ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট ও পা ফোলার কারণ হল— ফুসফুসের আবরণীতে জল জমে ফুসফুসে চাপ দেওয়া (pleural effusion) বা হৃদপিণ্ডের আবরণীতে জলে জমে হৃদপিণ্ডে চাপ দেওয়া (pericardial effusion)।

যক্ষ্মা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবেন কী ভাবে?

ডাক্তার যখন সন্দেহ করেন যে রোগীর যক্ষ্মা হতে পারে তখন তিনি নিচের পরীক্ষাগুলো করিয়ে রোগ-নির্ণয়ে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করেন।

- বুকের এক্স-রে (ফুসফুসের যক্ষ্মারোগীদের অধিকাংশের বুকের এক্স-রে-তে অস্বাভাবিকত্ব পাওয়া যায়)।
- কফ পরীক্ষা (ফুসফুসের যক্ষ্মায় অনেক ক্ষেত্রে কফ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে তা থেকে টিবি-র জীবাণু অণুবীক্ষণে দেখা যায় ও সেই জীবাণুর চাষ করা যায়। সাধারণত পরীক্ষার জন্য তিনটে নমুনা নেওয়া হয়)।
- কোনও কোনও ক্ষেত্রে রোগীর মূত্র পরীক্ষা করে টিবি-র জীবাণু খোঁজা হয়।
- গলায় বা অন্যত্র গ্ল্যান্ড ফোলা থাকলে তা থেকে সূঁচ দিয়ে রস নিয়ে পরীক্ষা করা হয় বা তা অপারেশন করে কেটে পরীক্ষা করা হয়।
- ফুসফুসের আবরণীতে জল জমলে সূঁচ দিয়ে কিছুটা জল টেনে তা পরীক্ষা করা হয়। জল বার করে শ্বাসকষ্টও কিছুটা কমানো যায়। এর সঙ্গে সেখান থেকে বায়োপ্সিও নেওয়া যায়।
- পেটে জল জমলে সে জল সূঁচ দিয়ে টেনে পরীক্ষা করা যায়।
- মস্তিষ্ক বা মেরুদন্ড যক্ষ্মায় আক্রান্ত হল— সিটি স্ক্যান করে দেখা যেতে পারে,কখনও সুষুম্নাকাণ্ডের আবরণী থেকে রস টেনে (lumber puncture) পরীক্ষা করা হয়।

যক্ষ্মার চিকিৎসার মূল নীতিগুলো কী?

- ৯০%-এরও বেশি ক্ষেত্রে যক্ষ্মা পুরোপুরি সেরে যায়, যদি রোগী তাঁকে দেওয়া সব ওষুধ পুরো সময় ঠিকঠাক খান
- যক্ষ্মার চিকিৎসা চলে ৬ মাস বা তার বেশি সময় ধরে
- যে যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা চলছে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাঁরা থাকেন তাঁদের সবাইকে খুঁজে বার করতে হবে।

যে যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা চলছে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাঁরা থাকেন, তাঁদের সবাইকে কেন চিহ্নিত ও খুঁজে বের করতে হবে?

যে রোগী কাশছেন তাঁর কফের মাধ্যমে যক্ষ্মার জীবাণু ছড়ানোর ঝুঁকি আছে। তাই কোনও যক্ষ্মা-রোগীর অসুস্থতার শুরু থেকে তিনি যাঁদের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের চিহ্নিত করে খুঁজে বার করা উচিত। সাধারণত এঁরা হয় রোগীর পরিবারের লোক, না হয় তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা। রোগীর থেকে এঁদের মধ্যে জীবাণু ছড়িয়ে থাকতে পারে। আবার উল্টোটাও হতে পারে, এঁদের কারও থেকে রোগীর সংক্রমণ হয়ে থাকতে পারে। যাই হোক না কেন, তাঁদের মধ্যে যিনি বা যাঁরা রোগাক্রান্ত বলে ধরা পড়বেন তাঁর বা তাঁদের চিকিৎসা করতে হবে, যাতে জীবাণু আরও না ছড়ায়।

যক্ষ্মা রোগীর ওষুধ খেতে না ভোলা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? কেনই বা কোর্স শেষ হওয়ার আগে ওষুধ বন্ধ করা চলবে না?

তেমনটা করলে—

- তাঁর আবার যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যাবে।
- আবার যক্ষ্মা হলে চিকিৎসা করাটা কঠিনতর হওয়ার বেশি সম্ভাবনা, কেন না জীবাণুগুলোর প্রথমে ব্যবহৃত ওষুধগুলোতে বেশি প্রতিরোধী হওয়ার সম্ভাবনা। তখন যে সব ওষুধ দিতে হবে সেগুলোর দাম ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দু-ই বেশি।
- আত্মীয়-বন্ধু -সহকর্মীদের সংক্রামিত করার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে।
- খারাপ ধরনের কিছু ফুসফুসের যক্ষ্মায়, রোগীর চিকিৎসা পুরো না হয়ে

খারাপ ধরনের কিছু ফুসফুসের যক্ষ্মায়, রোগীর চিকিৎসা পুরো না হয়ে থাকলে এবং ফুসফুসের অনেকটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে রোগীর শ্বাসকষ্ট থেকে যাবে, ফুসফুসে ক্ষতচিহ্ন থেকে যাবে।

থাকলে এবং ফুসফুসের অনেকটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে রোগীর শ্বাসকষ্ট থেকে যাবে, ফুসফুসে ক্ষতচিহ্ন থেকে যাবে। জীবাণু-সংক্রমণ থেকে যাওয়ায় ফুসফুসের ঘা ভাল ভাবে শুকোয় না, তাই বারবার ফুসফুসে ব্যাকটেরিয়া -সংক্রমণ হতে থাকবে। তারপর রোগী ধূমপায়ী হলে তো আরোই খারাপ।

যক্ষ্মার চিকিৎসা কী, কত দিনই বা চিকিৎসা চলবে?

ডাক্তার রোগীর জন্য কোন চিকিৎসা ও ওষুধের ব্যবহার, বা 'রেজিম' পছন্দ করছেন, তার ওপর নির্ভর করে চিকিৎসা চলবে ৬ মাস বা তারও বেশি। রোগ কতটা গুরুতর, কোন কোন অঙ্গ আক্রান্ত (যেমন মস্তিষ্ক আক্রান্ত হলে বেশি দিন চিকিৎসা চলবে), কত তাড়াতাড়ি কফ জীবাণুমুক্ত হচ্ছে— এ সব বিচার করে ডাক্তার 'রেজিম'এ বাছেন।

- বহু-ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা না হয়ে থাকলে সাধারণত বড়ি খাইয়েই চিকিৎসা করা হয়।
- যক্ষ্মার বিরুদ্ধে প্রথম সারির ওষুধ হল—রিফামপিসিন (Rifampicin), আইসোনিয়াজাইড (Isoniazid), পাইরাজিনামাইড (Pyrazinamide) এবং ইথামবুটল (Ethambutol)।
- ৬ মাসের কোর্স-এ যে সব যক্ষ্মা-রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে, তাঁদের প্রথম দু'মাস চারটে ওষুধই দেওয়া হয়। দু'মাস পর, রোগীর অবস্থার উন্নতি হয়ে থাকলে কেবল দু'টো ওষুধ (রিফামপিসিন ও আইসোনিয়াজাইড) বাকি চার মাস দেওয়া হয়।
- কখনও কখনও এসব ওষুধের দু'টো বা তিনটেকে একটা বড়িতেই মিশিয়ে দেওয়া হয়, যাতে রোগীকে কম বড়ি খেতে হয়।

যক্ষ্মার ওষুধগুলোর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

- রিফামপিসিন খেলে মূত্র, চোখের জল ও লালার রঙ কমলা হয়। এটা ক্ষতিকর নয়, এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।
- বেশির ভাগ যক্ষ্মার ওষুধে চামড়ায় ফুসকুড়ি হতে পারে।
- যক্ষ্মার ওষুধগুলোর সবচেয়ে বিপজ্জনক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হল যকৃৎ অর্থাৎ লিভারে ক্ষতি। পাইরাজিনামাইড, আইসোনিয়াজাইড ও রিফামপিসিনে এমনটা হতে পারে। তাই চিকিৎসা শুরুর আগে রোগীর 'লিভার ফাংশন টেস্ট' করে নেওয়া উচিত। চিকিৎসা চলাকালীন একনাগাড়ে বমি-ভাব, বমি, পেট-ব্যথা, বা জন্ডিস হলে আবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত। রোগীদেরও এই সব উপসর্গ সম্বন্ধে সতর্ক করে রাখা উচিত।
- ইথামবুটলে আবার দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত হতে পারে, তাই চিকিৎসা শুরু করার আগে এক বার চোখ পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত।

আবারও মনে করাচ্ছি

- রোগী পুরো সময় নিয়মিত ওষুধ নিলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যক্ষ্মা পুরোপুরি সেরে যায়।
- যাতে রোগী থেকে অন্যদের রোগ না ছড়ায়, তাই তাঁর ঘনিষ্ঠ মানুষদেরও চিহ্নিত করা দরকার।

লেখক পরিচিতি : ডা. বিশ্বজিত চক্রবর্তী যুক্তরাজ্যের লিভারপুলের ইউনিভার্সিটি হসপিটাল আইনট্রি-র আইনট্রি চেস্ট সেন্টার-এর শ্বাসরোগ-বিশেষজ্ঞ।

নবজাতকের খাদ্য-খাবার

প্রথম পাঠ

মায়ের দুধ কী ভাবে তৈরি হয়?

*লেখাটা মায়েরা পড়ার থেকে হবু মায়েরা পড়লে লেখার উদ্দেশ্য বেশি সার্থক হবে। এমনকী, হবু দাদু, দিদিমা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমাও যদি পড়েন, তবে ভাল হয়। কারণ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বেশির ভাগ মা এবং দিদিমারাই অভিযোগ করেন যে বাচ্চা বুকের দুধ পায় না, খাবে কি? এ-প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন—***ডা. স্বপন বিশ্বাস।**

সত্যিই তো, ছোট শিশু বুকের দুধ না পেলে, কান্নাকাটি করলে, কোনও মা-বাবা বা দাদু-দিদিমা চুপ থাকতে পারেন? কাজেই কিনে আনতে হয় ল্যাকটোজেন বা নান বা সে রকম অন্য দুধ, খাওয়াতে হয় শিশুকে। অবশ্য তার আগে থেকে বিভিন্ন হাসপাতাল এবং নার্সিহোমের অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ধাইরা বাচ্চা জন্মানোর সাথে সাথে বলে দেয় দুধ আনো, প্রথমে তো মায়ের দুধ আসে না, দুধ না আনলে বাচ্চা খাবে কী? বাবা বা দাদু মনের আনন্দে দুধ আনেন—বাচ্চা দুধ খায়। মা নিশ্চিন্ত হয়, বাবা নিশ্চিন্ত হয়, ধাইও নিশ্চিন্তে বাচ্চা দেখে। কিন্তু কী হয়ে গেল— তা কেউ জানলো না। পাঁচ-সাত দিন পরে শিশু বাড়ি এল, কিন্তু মায়ের বুকে দুধ এল না। আমরা ডাক্তাররা যতই থিওরি পড়ি, যতই থিসিস লিখি, উপদেশ দিই, মা-বাবা যতই শিক্ষিত হন —গলদ একটা ঘটেই গেল। আমাদের কোনও বিদ্যাই কাজে লাগল না—কাজে লাগল ধাইয়ের উপদেশ। ধাই নির্ধারণ করে দিল ভবিষ্যত। শিশুর ভবিষ্যত, মায়ের বুকের দুধের ভবিষ্যত। জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, নেই পরিকল্পনা, নেই—কোথায় কাকে কী শেখাতে হবে সেই ধারণা। ফলে সবটাই শূন্য দাঁড়িয়ে গেল। এ সেরকম—ইঞ্জিনিয়ার অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে বাড়ির প্ল্যান বানাল, মাটি পরীক্ষা হল, ভাল রড এল, ভাল সিমেন্ট এল, ঠিক পরিমাণে দেওয়াও হল, কিন্তু বাড়ি ভেঙে পড়ল। কারণ জোগাড়ে ছেলেটা সিমেন্ট বালি ভাল করে মেশালো না, কোথাও সিমেন্ট পড়ল, কোথাও পড়ল না। জোড়া লাগল না। বাড়ি ভাঙল। সব উদ্যোগ, শিক্ষা তখন শূন্যে দাঁড়িয়ে গেল। তেমনি ডাক্তারের জ্ঞান, মা বাবার বিদ্যা, দাদু দিদিমার অভিজ্ঞতা সব ওই ধাইয়ের কাছে গিয়ে শূন্যে দাঁড়িয়ে গেল। অনেকে বলবেন—তবে কি সব মায়েরই দুধ হবেই? আমি বলব—হ্যাঁ হবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। পৃথিবীতে কয়েক লক্ষ প্রজাতির স্তন্যপায়ী আছে—তার মধ্যে একমাত্র মানুষের শিশুর জন্যেই বাইরের দুধ তৈরি হয়। আর কারও লাগে না কেন? কোনও কোনও মা শারীরিক ভাবে রুগ্ন বা অসমর্থ হতে পারেন, কোনও মায়ের অপারেশনের বড় ধকল যায়, তাদের ছাড়া আর কারও শিশুর জন্যে বাইরের দুধের প্রয়োজন হওয়ার কথা নয়। ধাইদের এই অশিক্ষাকে ঠিক করতে বাবা মা এবং দাদু-দিদারও একটা বড় ভুমিকা আছে। তাই তাঁদের জন্যে এই লেখা। তাঁরা যদি দুধ তৈরির শারীরবৃত্তীয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন, তবে তাঁরাও বলবেন মায়ের দুধ হবে, তখন তখন তাঁরাই বাইরের দুধের বদলে মায়ের দুধ খাওয়ানোর জন্যে ধাইদের বলবেন। তখন মায়ে-ছায়ে গায়ে-গায়ে থেকে মায়ের বুকের দুধে শিশু বড় হবে। আমাদের ডাক্তারি বিদ্যার তখনই বাস্তব প্রয়োগ হবে।

শিশুর ভ্রূণ অবস্থার চতুর্থ সপ্তাহেই স্তন তৈরি হতে শুরু করে। জন্মাবার কিছু আগেই কন্যাসন্তানের স্তন গঠিত হয়ে যায়— যেখানে ১৫-২৫টি সরু নালিকা থাকে। মানুষের স্তনই একমাত্র গ্রন্থি, যা জন্মানোর সময় সম্পূর্ণ তৈরি হয় না। তৈরি হয় পরে। মেয়েদের ১০-১২ বছর বয়স থেকে স্তনের বিকাশ শুরু হয়। এই পরিবর্তন আসে ইস্ট্রোজেন নামে একটি হরমোনের প্রভাবে। তার এক-দুবছর পর থেকেই মেয়েদের ঋতুচক্র শুরু হয়। প্রত্যেক ঋতুচক্রে হরমোনের প্রভাবে একটু একটু করে স্তনের বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটে। যে ১৫-২৫টি নালিকা ছিল, তারা ডালপালা মেলে একে একটি গাছের মতো আকার ধারণ করে। গাছের গোড়া থাকে স্তনের বৃন্তে, ডাল পাতা বুকের দিকে। তার চারিদিকে জমা হয় চর্বি বা ফ্যাট। স্তন গোল হয়ে নির্দিষ্ট আকার ধারণ করতে থাকে। এই বিকাশ ২০ বছর বয়স পর্যন্ত দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। এমনকী ৩৫ বছর পর্যন্ত ও চলতে পারে। কিন্তু মা না হলে কোনও মায়েরই স্তনের বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না।

তা হলে কি দেখলাম—স্তন তৈরি হয় প্রথমে ১৫-২৫টি দুগ্ধ নালিকা দিয়ে। তারা যেন মরা ডালপালা। তারপর তাদের শাখা-প্রশাখা বেরোল, পাতায় ভরে গেল গাছ। এ ভাবে প্রতিটি গাছ একটি করে আলাদা বিভাগ তৈরি করলো—তাদের বলে 'লোব'। যাকে কল্পনা করেছি পাতা—সেগুলোকে ডাক্তারি ভাষায় বলে 'অ্যালভিওলাই'। একে আঙুরের থোকার

সাথেও তুলনা করা চলে। সেখানেই ভবিষ্যতে দুধ তৈরি হয়। সেই দুধ শাখা প্রশাখা বেয়ে চলে আসে গোড়ার দিকে। এই গোড়া থাকে বাইরের দিকে। প্রতিটি গোড়া উন্মুক্ত হয় স্তনবৃন্তে বা 'নিপল'-এ। এই সম্পূর্ণ গাছটিকে ঠিকভাবে ধরে রাখে এক ধরনের যোগকলা। প্রতিটি শাখা প্রশাখাকে তারা বেষ্টন করে থাকে। তাদের আবার আরও শক্ত দড়ির মতো 'কুপার্স লিগামেন্ট' ঠিকমতো বেঁধে রাখে। আর এই সুতলি দড়ির মাঝে এবং চারি দিকে থাকে চর্বি বা ফ্যাট। আরেকটা কথা বলা দরকার—গাছের গোড়া, যা স্তনবৃন্তে শেষ হয়, সেটি কিছু আগে স্ফীত হয়ে থলির মতো হয়ে যায়। তাকে সাইনাস বলে। স্তনবৃন্তের চারিদিকে যে কালো গোল অংশ থাকে, ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলা হয় অ্যারিওলা, তার নীচে এই সাইনাসের অবস্থান। দুধ তৈরি হয়ে এখানে এসে সঞ্চিত হয়ে থাকে। এই অ্যারিওলা অংশ গর্ভবতী অবস্থায় কালো হয়ে যায়, যা নবজাতকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিশু ঠোঁট দিয়ে এই অ্যারিওলার উপর চাপ দেয়, ফলে সাইনাস থেকে দুধ নির্গত হয়ে তার মুখে যায়। এর উপর এবং চারপাশে ছোট ছোট উঁচু উঁচু কিছু গ্রন্থি থাকে—এদের বলে মন্টগোমারি গ্রন্থি। এটা এক ধরনের সিবেসিয়াস গ্রন্থি, এখান থেকে যে রস নিঃসৃত হয়, তা স্তন ও স্তন বৃন্তকে নরম রাখে, জীবাণু মুক্ত রাখে। অর্থাৎ, গর্ভাবস্থার আগেই প্রকৃতি শিশুর দুধের ব্যবস্থা বা দুধ তৈরির কারখানা তৈরি করে রাখে।

এই যে গাছের কথা বললাম, এই গাছ তখনও শীতের পাতাঝরা গাছের মতো। গর্ভাবস্থায় সে হয় বসন্তের গাছ। ফুলে ফলে ভরে যায়। প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেন হরমোন বেড়ে যায় ১০ থেকে ২০ শতাংশ। তার প্রভাবে প্রায় সমগ্র স্তনটিই এই গাছের পাতা ফলে ভরে যায়, চর্বিও উধাও হয়। অ্যালভিওলাইয়ের কোষগুলো দুধ তৈরির জন্য প্রস্তুত হয়। এই অ্যালিভিওলাই হল ছোট থলির মতো। তার চারপাশে ঘিরে থাকে কোষ, যেখানে দুধ তৈরি হয়। কোষে দুধ তৈরি হয়ে আসে অ্যালভিওলাইতে, সেখানে দুধ জমে, তারপর সেখান থেকে নালিকা বেয়ে সাইনাসে এসে জমা হয়। চার-পাঁচ মাস পরে সেখানে 'কোলস্ট্রাম' নামক প্রাথমিক দুধ তৈরি শুরু হয়।

দুধ তৈরি শুরু

সমগ্র দুধ তৈরির প্রক্রিয়াকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্যায় (ল্যাকটোজেনেসিস-১), দ্বিতীয় পর্যায় (ল্যাকটোজেনেসিস-২) এবং তৃতীয় পর্যায় (ল্যাকটোজেনেসিস-৩)।

প্রথম পর্যায় (ল্যাকটোজেনেসিস-১) :

প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায় দু'টি হরমোনের নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রোজেস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন নামক হরমোনদু'টি গর্ভাবস্থার প্রধান হরমোন। শিশুর সম্ভাব্য জন্মের ১২ সপ্তাহ আগে এই পর্যায় সম্পূর্ণ হয়। যদিও শুরু হয় গর্ভাবস্থার চার পাঁচ মাস থেকে। এই সময়ে শুধু 'কোলস্ট্রাম' নামক প্রাথমিক দুধ তৈরি শুরু হয়। দুধে ল্যাকটোজ, প্রোটিন, ইমিউনোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়ে। সোডিয়াম ও ক্লোরিনের পরিমাণ কমে। দুধ তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় পদার্থ স্তনে এসে জমা হতে থাকে।

দ্বিতীয় পর্যায় (ল্যাকটোজেনেসিস-২) :

এই পর্যায়ও হরমোনের নিয়ন্ত্রণাধীন। শিশুজন্মের ৩০ থেকে ৪০ ঘন্টা পরে এই পর্যায় শুরু হয়। জন্মের সাথে সাথে প্লাসেন্টা জরায়ু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তাই প্লাসেন্টা থেকে বের হওয়া হরমোন, যথা প্রোজেস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন এবং প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেনও হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়। শুরু হয় প্রোল্যাকটিনের কাজ। দুধ তৈরিতে এই প্রোল্যাকটিন হরমোন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একে বলে মাতৃত্ব হরমোন বা mothering hormone. প্রোল্যাকটিন-এর কাজ হল প্রকৃত দুধ তৈরি করা। প্রোল্যাকটিনের ক্ষরণ অ্যারিওলার উত্তেজনার উপর নির্ভরশীল। শিশু স্তন মুখে নিয়ে টানলেই এই উত্তেজনা (stimulation) তৈরি হয়। না টানলে হবে না, তাই প্রোল্যাকটিনও বের হবে না—দুধও তৈরি হবে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, শিশু দুধ না খেলে দুধ তৈরির পদ্ধতি গোড়াতেই ধাক্কা খাবে। দুধই তৈরি হবে না। দুধ বুকে আসুক বা না আসুক, বুকের দুধ পেতে গেলে জন্মানোর পর যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, শিশুকে বুকে দিতে হবে। শিশু স্তন মুখে নিয়ে টানলে তবেই ভবিষ্যতে দুধ হবে, না হলে হবে না। প্রতি বার দুধ খাওয়ার পরে এই প্রোল্যাকটিনের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায়। দিনে-রাতে সব সময়েই এই ঘটনা ঘটে। তাই দুধের পরিমাণ বাড়াতে হলে বা ঠিক রাখতে হলে দিনে-রাতে সব সময়ই শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।

প্রোল্যাকটিন হরমোন শুধু দুধই তৈরি করে না, কিছু কিছু হরমোনের নিঃসরণ কমিয়ে দিয়ে পরবর্তী শিশুজন্মের ব্যবধানও বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া শিশুদের অন্ত্রে সোডিয়াম, পটাসিয়ম, ক্যালসিয়ামের শোষণ বাড়ায়।

প্রোল্যাকটিন হরমোন তো দুধ তৈরি করল। আঙুরের থোকার মত অ্যালভিওলাই ভরে গেল দুধে। কিন্তু সেই দুধ তো সেখান থেকে বেরোতে হবে। কিন্তু কী ভাবে? এই আঙুর নিঙড়ে রস বের করার মতো অ্যালভিওলাই চেপে দুধ বের করে যে হরমোন তার নাম অক্সিটোসিন। শিশু জন্মানোর পর অক্সিটোসিনের কার্যক্ষমতা দশ গুণ বেড়ে যায়। এই হরমোনও পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে বের হয়। স্তনবৃন্তে উত্তেজনার ফলে পিটুইটারি থেকে অক্সিটোসিন নিঃসৃত হয়। শিশু মুখ দিয়ে দুধ টানলেই এই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। একে 'লেট ডাউন রিফ্লেক্স' বা 'মিল্ক ইজেকশন রেসপন্স' বলে।

লেট ডাউন রিফ্লেক্স বা মিল্ক ইজেকশন রেসপন্স :

এই ব্যাপারটাও ভাল ভাবে বোঝা দরকার। একটা জলভরা বেলুনে যেমন বাইরে থেকে চাপ দিলে জল বেলুনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, তেমনি

অ্যালভিওলাইকে বাইরে থেকে চাপ দিলে তাতে জমে থাকা দুধ নালা দিয়ে বেরিয়ে এসে শিশুর মুখে যায়। এই চাপের কাজটা করে অ্যালভিওলাই ঘিরে থাকা মাংসপেশী। আর চাপের কাজটা করায় অক্সিটোসিন হরমোন। মা যখন ভাবেন যে তিনি দুধ খাওয়াবেন, তখন থেকেই এই রিফ্লেক্স শুরু হয়ে যায়। তখন থেকেই অক্সিটোসিন নিঃসরণ শুরু হয়। তারপর শিশুর মুখ স্তনবৃন্তে চাপ দিলে আরও অক্সিটোসিন বের হয়। অক্সিটোসিন শুধু অ্যালভিওলাইকে চাপ দেয় না, এটি জরায়ুর মাংসপেশীকেও চাপ দেয়, ফলে অনেক মা শিশুকে দুধ খাওয়ানোর সময় তলপেটে ব্যথা অনুভব করে। প্রথম দিকে দুধ আসতে ৫ থেকে ৮ মিনিট সময় লাগতে পারে। পরে কম সময় লাগে। মা-ও বুঝতে পারে যে বুকে দুধ এসেছে বা দুধ নামছে। নতুন মায়ের এটা বুঝতে এক দু'সপ্তাহ সময় লাগতে পারে।

কাজেই এটা বোঝা গেল যে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে এই চিন্তা থেকেই শুরু হয় দুধ তৈরি এবং দুধ বেরোনোর কাজ। শিশু দুধ টানলে তবেই দুধ তৈরি হয় এবং বুকে দুধ আসে।

তৃতীয় পর্যায় (ল্যাকটোজেনেসিস-৩) :

এই পর্যায়ে বুকে পরিণত দুধ তৈরি হয়। আমরা দেখলাম প্রথম দু'টি পর্যায় নির্ভর করে প্রধানত হরমোনের ওপর। কিন্তু তৃতীয় পর্যায় নির্ভর করে বুকের অটোক্রিন বা স্থানীয় অবস্থার উপর। প্রথম দুটি পর্যায় দুধ তৈরি শুরু করে—তৃতীয় পর্যায় এটিকে চালু রাখে। এই চালু রাখাটা নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে শিশুর উপর, সে দুধ খাচ্ছে কি না তার উপর। এই পর্যায় শুরু হয় শিশু জন্মের ৫০ থেকে ৭৩ ঘণ্টা পর। এই পর্যায়ের আগে আমরা দেখলাম, অ্যালভিওলাইগুলো দুধে ভরে যায়। শিশু মুখ দিয়ে টানলে তবে সে দুধ বেরিয়ে আসে।

কিন্তু শিশু যদি না টানে? কী হবে? অ্যালভিওলাইতে জমে থাকা দুধ নতুন ভাবে দুধ তৈরিতে বাধা দেয়। দু'ভাবে—

১। দুধে এক প্রকার প্রোটিন থাকে, তাকে বলে FIL (Feedback inhibitor of lactation), এটি দুধ তৈরিতে বাধা দেয়। বুকে দুধ যত জমতে থাকে, ততই এই প্রোটিনের পরিমাণ বাড়তে থাকে আর নতুন দুধ তৈরি কমতে থাকে। শিশু দুধ টেনে খেলে অ্যালভিওলাই ফাঁকা হয়ে যায়, ফলে আবার নতুন দুধ তৈরি শুরু হয়।

২। এ ছাড়া আগে যে প্রোল্যাকটিন হরমোনের কথা বলেছি, যত দুধ জমতে থাকে, এই হরমোনের কাজও কমতে থাকে—ফলে নতুন দুধ তৈরি কমে যায়।

আবার শিশু না খেলে অ্যালভিওলাইতে জমে থাকা দুধ আবার শোষিত হয়ে অ্যালভিওলাই শুকিয়ে যেতে পারে, কিংবা বেশি দুধ জমে ফেটে যেতে পারে।

দুধ যত খালি হয়, ততই নতুন দুধ তৈরি হয়। শিশু যত দিন ধরে দুধ খায়, তত দিন ধরে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং বুকে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা কম বেশি দুধ তৈরি হতে থাকে। কাজেই বুকে দুধ নেই, এরকম হয় না। সকালের দিকে দুধ বেশি জমে থাকে, দিন যত বাড়ে, দুধের জমা পরিমাণ কমতে থাকে। তবে কারও বুকে অনেক দুধ জমা থাকতে পারে, কারও বুকে কম জমে। দুধ জমার পরিমাণ বুকের আকারের উপর নির্ভর করে না। যে মায়ের বুকে কম দুধ জমে, তাকে বার বার করে শিশুকে দুধ দিতে হবে। তবে দুধ তৈরি হবে এবং শিশু সম্পূর্ণ পুষ্টি পাবে। প্রতি বার শিশু তার মায়ের বুকের ৭৫-৮০% দুধ খেতে পারে। শিশু দুধ না খেলে কয়েক দিনের মধ্যেই দুধ তৈরি কমে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

বুকের দুধের রকমফের :

প্রথমে তৈরি হয় কোলস্ট্রাম (colostrum) নামের দুধ। দেখতে কিছুটা হলদেটে বা হাল্কা কমলা রঙের। গাঢ় দুধ। এতে বিভিন্ন খনিজ লবণ, ভিটামিন বেশি থাকে। প্রতি ১০০ মিলিলিটারে ৫৮ কিলোক্যালোরি শক্তি থাকে। পেটে গিয়ে এই দুধ শিশুর পায়খানা নরম করে গর্ভে থাকাকালীন পেটের জমা ময়লা মল বের করে দেয়। এর ফলে শিশুর নিওনেটাল জন্ডিসও কম হয়। প্রথম দিনে (২৪ ঘন্টায়) মাত্র ৭-১২৩ মিলি কোলস্ট্রাম তৈরি হয়, শিশু প্রতি বারে ৭-১৪ মিলি গ্রহণ করে। দ্বিতীয় দিন থেকে বাড়তে বাড়তে ৫ম দিনে এর পরিমাণ হয় ৫০০ মিলিলিটার।

ট্রানজিসানাল দুধ (Transitional Milk) : পরিণত দুধ ও কোলস্ট্রামের মাঝামাঝি এই দুধ। জন্মের ১২ ঘন্টা থেকে ৭-১৪ দিন পর্যন্ত এই দুধ তৈরি হয়। এই দুধে ক্যালরি এবং প্রোটিন, ইমিউনোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে আর ল্যাকটোজ ও ফ্যাটের পরিমাণ বাড়ে।

পরিণত দুধ (Mature milk) : জন্মের নবম দিনের মাথায় এই দুধই প্রধান দুধ। তারপর থেকে এই দুধই তৈরি হয়। এটি দেখতে কিছুটা নীলচে, পাতলা ধরনের দুধ। এতে শিশুর প্রয়োজনীয় সব রকমের উপাদানও থাকে। জলের পরিমাণ থাকে ৮৭ শতাংশ। কাজেই এই দুধ খেলে শিশুর আর জলের প্রয়োজন হয় না।

আপাতত এটুকুই। এই লেখার উদ্দেশ্য যাতে মায়েরা তার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান। দুধ খাওয়াবো এই চিন্তা মাথায় আনতে হবে, শিশুকে জন্মের পর পরই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বুকে ধরে টানাতে হবে—তবেই বুকে দুধ আসবে, আসবেই। আয়া বা ধাই যদি বাইরের দুধ কিনে আনতে বলে, তাকে বোঝাতে হবে—বুকের দুধ খাওয়াও। কারণ শিশুকে বুকে না ধরলে দুধ আসবে না, দুধ শুকিয়ে যাবে। হবু বাবা-মা, দাদু-দিদিমারা সতর্ক হলে তবেই শিশু বুকের দুধ পাবে এবং আমার লেখা সার্থক হবে।

লেখক পরিচিতি : ডা. স্বপন বিশ্বাস, এম বি বি এস, ডি সি এইচ, এম ডি, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

ADVT

glenmark

Inspiring Innovation

Leading Integrated Research Based
Global Pharmaceutical Company

- Out-licensing GBR 500, the monoclonal antibody in a landmark deal
- First novel biologics out-licensing deal from an Indian company

Gracewell Speciality

Offering you advanced therapeutic options in Dermatology

চলচ্চিত্রে ডাক্তার | অলীক সুখ

ডাক্তার যখন ডেমন, অথবা একটি নিছক ভূতের গল্প

অংশুমান ভৌমিক

‘রোগিণীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নার্সিংহোম ভাঙচুর’।

আনন্দবাজারের প্রথম পৃষ্ঠায় জ্বলজ্বল করছিল হেডলাইনটা। সকালে জলখাবার খেতে বসে কাগজে চোখ বোলাতে গিয়ে সব কিছু ছাপিয়ে ওই হেডলাইনটাই চোখে পড়েছিল বুড়ো বাবার। সেই থেকে একে একে সবার। চিন্তারই কথা। মনোহরপুকুর সেকেন্ড লেনের এই ভাড়া বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে যাঁরা অনেক দিন বসবাস করছেন তাঁদের সবার কপালে ভাঁজ পড়েছিল সেদিন সকালে। এন্টালির যে নার্সিংহোমে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে রোগিণীর মৃত্যু হয়েছে সেই নার্সিংহোমে রোজ যাতায়াত ডা. কিংশুক গুহ-এর (দেবশঙ্কর হালদার)। কিংশুক গাইনোকোলজিস্ট। কবিতা মণ্ডল (সোহিনী সেনগুপ্ত) বলে যে রোগিনীর মৃত্যুকে ঘিরে ওই মুনলাইট নার্সিংহোমে আগের দিন সন্ধ্যে থেকে হুলুস্থুলু হয়েছে, কিংশুকই তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। ডেলিভারির পর বেশ কয়েক ঘণ্টা তিনি নার্সিংহোমে ছিলেন না। কবিতার অবস্থা ক্রমশ খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়েছে। মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতরেছেন। তবু নার্সিংহোমে ফিরতে পারেননি কিংশুক। যখন ফিরেছিলেন ততক্ষণে সবশেষ। এ ক্ষেত্রে যা হয়, ডাক্তারের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে।

এটা সেই কিংশুকেরই বাড়ি কি না! ভাঙচুরের আঁচ পড়েছে বাড়ির সবার মনে।

কিংশুকের স্ত্রী রম্যাণি (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) থম মেরে আছেন। চার বছরের ছেলে তাতান অতশত বোঝে না। কিংশুকের মা আকুল হয়ে ছেলেকে বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ রে, তোর কাছ থেকে ওরা ড্যামেজ-ট্যামেজ চাইবে না তো?’ উত্তর পাননি। বাবা ভুরু কুঁচকে পুরো ব্যাপারটার মধ্যে ন্যায়নীতির প্রশ্ন তুলতে গিয়ে ছেলের কাছে ধমক খেয়েছিলেন, ‘কোনটা এথিক্যালি হচ্ছে?’

এথিক্যালি। অর্থাৎ এথিকস। উত্তেজনার বশে বা স্নায়ুবিক দুর্বলতার মুহূর্তে বলা হলেও ডাক্তার ও ডাক্তারিতে এথিকস নিয়ে পুরনো বিতর্কটাই ‘অলীক সুখ’ নামের ছবিটার আসল জায়গা। এসব আজকাল চায়ের ঠেকে গুলতানি হয়, ক্লাবঘরে পায়তারা হয়। এবার একটা বাংলা ছবি হল। হাল আমলে এ ধরনের ব্যাপারস্যাপার নিয়ে ছবি হয় না বললেই চলে। তাই স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র প্রকাশক, সম্পাদক থেকে শুরু করে এই কলমচি সবাইকে বেশ কৌতূহলী করে তুলেছে ‘অলীক সুখ’।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প নিয়ে এই ছবি বানিয়েছেন নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। যে মধ্যবিত্ত বাঙালি শহরে থাকে, খোকনের স্কুলের ব্যাগ নিজের পিঠে করে স্কুলগেটে ছেড়ে দিয়ে আশপাশের কোনও বাড়ির গেটের সামনে ঠায় বসে থাকে আর ফুরসত মিললে ঘরগেরস্থালির গল্প নিয়ে সহজসরল বই দেখতে সিনেমায় যায়, তাদের জন্য বছর দুয়েক আগে ‘ইচ্ছে’ বলে একটা ছবি বানিয়েছিলেন নন্দিতা-শিবপ্রসাদ। তাতে দিনে দিনে লায়েক হয়ে ওঠা ছেলে আর অষ্টপ্রহর আঁচল পেতে রাখা মায়ের সম্পর্কে চির এবং ক্রমান্বয়ে ফাটল দেখানো হয়েছিল। ‘অলীক সুখ’ ছবিতে ডাক্তার আর পেশেন্টের সম্পর্কে ফাটলগুলোকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন এই দুই পরিচালক। ভালো-মন্দের এই খেলায় বন্দুকের নল ডাক্তারবাবুদের দিকে তাক করা থাকলেও এই মর‍্যালিটি প্লে-তে মোটের ওপর তাদের দিকে ঝোল টেনেই কথা বলা হয়েছে। কিংশুক ডাক্তারবাবু ও তার জ্ঞাতগুষ্টির গাঁটের কড়িতে যে সিনেমা চলে, সেখানে প্রোলেতারিয়েতের ভাগে বেশি পড়লে বক্স অফিসে সাড়া পড়বে কী করে? মধ্যবিত্তের মনের কাছাকাছি এসেছে বলেই তো এক ফিল্ম ক্রিটিক নিদান দিয়েছেন ‘মেদবর্জিত গতিময়’। আরেক ফিল্ম ক্রিটিক

Acne, Hair Fall, Vitiligo – Do **NOT** Despair.
All are Treatable.
Consult your Dermatologist

ALKEM
Derma Care
Adding Value to Skin Care

A Division of **Alkem** Laboratories Ltd

লিখে দিয়েছেন—সুখের খোঁজে অসুখ খুঁজে পাওয়ার এক চিরন্তন বার্তা দিতে চেয়েছে অলীক সুখ।' ব্যাপারটা বুঝে ফেলে দেড়েল এক ফিল্ম ক্রিটিক টিপ্পনি কেটেছেন—বক্স অফিসে 'সুখ', হয়তো অলীক নয়।

একটা আগাপাশতলা কমার্শিয়াল বাংলা সিনেমা নিয়ে লিখতে গিয়ে শ্রেণি-সংগ্রামের ধরতাই দেওয়ার কোনও মানে হয় না জানি। তবু লিখতে হল। গেল ১৯ জুলাই সারা বাংলা জুড়ে অন্তত ৩৬টি হাউসে 'অলীক সুখ' মুক্তি পাওয়ার আগে ও পরে যে উচ্ছ্বাসের বন্যা দেখেছি, তার একটা জুতসই ব্যাখ্যা আপনাদের আগেভাবে জানানো দরকার বোধ করলাম। কারণ যে ন্যায়-অন্যায় নিয়ে 'অলীক সুখ' তর্ক জুড়েছে, ভাবিয়ে তুলেছে তার মাপকাঠি বলুন বা তুলাদণ্ড বলুন, সবটাই মধ্যবিত্ত বাঙালির মন ভজানোর জল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। গণবিনোদনের যে ফর্মুলায় বাজারি কাগজের পুজোসংখ্যার জন্য গল্প ফাঁদা হয়, এ ধরনের ছবি সেই বাজারমুখী ছাঁচে ফেলে ঢালাই করা। অতএব ছবির বিষয় আমাদের 'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'-র পাতায় আলোচনার জন্য লাগসই হলেও ছবি হিসেবে 'অলীক সুখ' বেশ সাদামাটা। আর যে বার্তা সে দিতে চায় তা শুধু অগভীর নয় অবান্তরও।

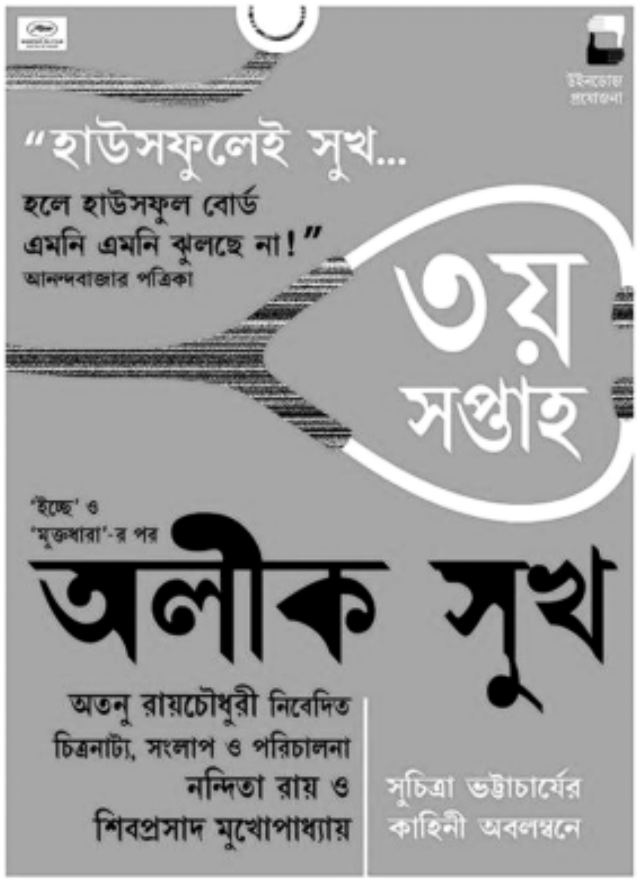

এ বার মূল আলোচনায় আসা যাক।

বলাই বাহুল্য যে এন্টালির মুনলাইট নার্সিং হোমে কবিতা মন্ডলের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুই 'অলীক সুখ'-এর সূচনাবিন্দু। অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাবার সময় ডা. কিংশুক গুহকে বারবার বলেছিলেন কবিতা, 'ডাক্তারবাবু, আমি ভাল হয়ে যাব তো? আমার কিছু হবে না তো?'

ডাক্তারবাবু আশ্বস্ত করেছিলেন। তবু সংকট তৈরি হয়েছিল। ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলে ইন্টারনাল-হেমারেজ, তাই হয়েছিল কবিতার। রক্তে ভরে গিয়েছিল তলপেট। যমে-মানুষে টানাটানি। আর এই জরুরি অবস্থায় ধারেকাছে ছিলেন না ডাক্তারবাবু। সাড়ে ৩টের পর নার্সিংহোম থেকে লাগাতার ফোন করা হয়েছিল তাঁকে। অনেক চেষ্টার পর পাওয়াও গিয়েছিল। তখন বাস্তবিকই ট্র্যাফিক জ্যামে আটকা পড়েছেন ডাক্তারবাবু। সাড়ে ৬টার আগে নার্সিংহোমে ফিরতে পারেন নি তিনি।

কিন্তু আদতে প্রশ্নটা অন্য। পেশেন্ট অপারেশন থিয়েটার থেকে কেবিনে না পৌঁছতেই কেন নার্সিংহোম ছাড়তে হল ডাক্তারবাবুকে? খবর নিয়ে জানা যাচ্ছে, পুরনো ভাড়াবাড়ি ছেড়ে গলফ গার্ডেনে কোটি টাকার ফ্ল্যাটে উঠে যাওয়ার তাড়া ছিল কিংশুকের। বিবাহবার্ষিকীতে স্ত্রী রম্যাণীর হাতে ওই ফ্ল্যাটের সেলস এগ্রিমেন্টের কপি তুলে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই নার্সিংহোমের অপারেশন থিয়েটারে মরণাপন্ন রোগীকে শুইয়ে রেখে তাঁকে ছুটতে হয়েছিল রিয়ালটরের অফিসে, বেচাকেনার চুক্তিপত্রে সইসাবুদ করতে। তাই কলের পর কল রিসিভ করতে পারেননি তিনি। যখন তাঁর সংবিৎ ফিরেছিল তখন তাঁর ফেরার পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছিল ট্র্যাফিক জ্যাম। চান্স ফ্যাক্টর, মন্দ কপাল, ফ্রিজিড কমপ্রেসার এ সব অজুহাত দিয়ে হাত ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন কিংশুক। ঘরে-বাইরে সেটাই ফলাও করে বলে বেরিয়ে ছিলেন।

তাঁর ডাক্তার বন্ধুদের কেউ পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'এ রকম দু'চারটে না ছড়ালে অ্যাডাল্ট হবি কী করে?' কেউ বুদ্ধি দিয়েছিলেন, ক'টা দিন চেপে যেতে। কদিন বাদেই আইপিএল। কলকাতা নাচবে। তখন ও-সব খবর কেউ পড়বে না।

মুদ্রার উল্টো পিঠে মৃত রোগিণীর পরিবার-পরিজন। কয়েকজন মিলে যুক্তি করে ঠিক করেছিলেন, 'ওই ডাক্তারটাকে একটা শিক্ষা দিতে হবে!' রোগিনীর স্বামী (বিশ্বনাথ) বুঝেছিলেন কাজটা সোজা নয়। শেষ কথা বলবে টাকা। 'আরে ধুর। ওই ডাক্তার ব্যাটার গাঁটের জোর অনেক বেশি।' তবু ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে একটা মামলা ঠুকে দিয়েছিলেন তাঁরা। ডেফিসিয়েন্সি ইন সার্ভিস-এর অভিযোগ এনে ১০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিলেন।

আদালতের সমন এসেছিল কিংশুকের কাছে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উকিলের প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি। মামলা রেফার করা হয়েছিল মেডিক্যাল কাউন্সিলের কাছে। তিন সদস্যের ইনভেস্টিগেশন টিম। তার প্রধান (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) কিংশুকের মাস্টার মশাই। খামোকা 'নর্মাল ডেলিভারি' না করিয়ে 'সিজারিয়ান ডেলিভারি'র জন্য কেন খেপে উঠেছিলেন কিংশুক সে প্রশ্নের সদুত্তর পেলেন না তিনি। অপারেশন থিয়েটার থেকে পেশেন্টকে কেবিনে না পাঠিয়ে নার্সিংহোম ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটাই কিংশুকের বিরুদ্ধে গেল। মাস্টারমশাই খোঁজখবর নিয়ে জেনেছেন, সারাদিন দৌড়চ্ছে তাঁর প্রিয় ছাত্র। দিনে পাঁচটা চেম্বার, দু'টো নার্সিংহোম, চারটে করে অপারেশন। একেকটা চেম্বারের জন্য বরাদ্দ এক ঘন্টা। গড়ে ১০টা রোগী। প্রত্যেক রোগীর জন্য গড়ে তিন থেকে চার মিনিট দিতে পারেন কিংশুক। 'চার মিনিটে রোগীর মন জানবে না রোগ জানবে?' জিজ্ঞেস করেছিলেন মাস্টারমশাই। কিংশুক হাঁসফাঁস দশা কাটিয়ে কোনও রকমে বলতে পেরেছিল, 'স্যার, আমি কোনও দিন আপনি হতে পারব না স্যার। আপনি হাতে হাত দিয়েই পালস রেট বুঝতে পারতেন, আমি স্টেথোস্কোপ লাগিয়েও বুঝতে পারি না।'

তা বলে 'অলীক সুখ' ডাক্তারদের গণশত্রু বানিয়ে ছেড়েছে এমনটা মোটেই নয়। সাধারণ মানুষের মনে ব্যস্তসমস্ত ডাক্তার ও তাঁদের ডাক্তারির কেতাকায়দা নিয়ে যে সব ধারণা চালু আছে সে সব নিয়ে একটা গল্প বলতে চেয়েছে এই মাত্র।

এত কিছুর পর মেডিক্যাল কাউন্সিলের রিপোর্ট তার অনুকূলে যাবে না বুঝতে পেরেছিলেন কিংশুক। এ দিকে 'লাইসেন্স টু প্র্যাকটিস' বাজেয়াপ্ত হলে সাড়ে সর্বনাশ। তাই ডাক্তার বন্ধুদের পরামর্শে উকিলের (খরাজ মুখোপাধ্যায়) মধ্যস্থতায় কবিতা মণ্ডলের পরিবারকে ম্যানেজ করে নিয়েছিলেন তিনি। আর রেগে ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে যাওয়া স্ত্রী রম্যাণিকে ফোন করে বলেছিলেন, 'রুমি, আমি ওদের কিনে নিয়েছি। জাস্ট কিনে নিয়েছি।'

এ ছাড়াও 'অলীক সুখ'-এ আরও অনেক কিছু ছিল। কিংশুক-রম্যাণির মন-কষাকষি, কী ভাবে বাবা-মাকে ভবানীপুরের পুরনো বাড়িতে রেখে গলফ গার্ডেনে রম্যাণি আর তাতানকে নিয়ে আলাদা সংসার পাতা যায় তা নিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে কিংশুকের 'ডিনার ডিপ্লোম্যাসি', বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে থিম পার্টি, এমনকী মৃত কবিতার অতৃপ্ত আত্মার সঙ্গে রম্যাণির অদ্ভুত সংলাপ (ব্যাপারটা এত দরকাঁচা যে এর জন্য 'অলীক সুখ'-কে কেউ কেউ 'ভূতের বই' বলছেন)। শেষ দিকে অলৌকিক সমাপতনে রম্যাণিকেও দুর্ঘটনার শিকার হয়ে বারুইপুরের নার্সিংহোমে ভর্তি হতে হয়, কবিতা আর রম্যাণির গল্পের ভেতরকার ফারাকগুলো মিলিয়ে যেতে থাকে। এসব আজগুবি মেলোড্রামায় আমাদের না মজলেও চলবে। আমরা বরং বুঝে নিই এই সময়ের ন-অতি-জনপ্রিয় বাংলা ছবি কোন চাউনিতে ডাক্তার ও ডাক্তারিকে দেখছে।

ডা. কিংশুক গুহ এক শ্রেণির ডাক্তারের প্রতিনিধি। এই ডাক্তারদের চরিত্র কী?

এক, তাঁরা সারাদিনমান ডাক্তারি করেন। কোনও বিশেষ হাসপাতালে তাঁদের টিকি বাঁধা নেই। শোফার-ড্রিভন কার নাই বা থাকল, সুইফট ডিজায়ারে সওয়ার হয়ে তাঁরা সর্বগ। পূর্ববর্তী প্রজন্মের ডাক্তারবাবুরা তাঁদের সম্পর্কে বলেন, 'তোমরা আজকালকার ছেলেরা বড্ড ইমপেশেন্ট।'

দুই, ধুত্তেরি নিকুচি করেছে তোর ইমপেশেন্টের। তাঁদের পেছন পেছন ফেউয়ের মতন লেগে থাকেন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভরা। নতুন নতুন ওষুধ বাজারে আসে। তাঁরা প্রেসক্রিপশনে সেগুলো লেখেন। লিখতে অসুবিধা কীসের? হাতের যে কলম জনমদুখি, তাকেও বেচে দিয়েছেন তাঁরা। যে রোলেক্স ঘড়ির কাঁটায় তাঁদের সারাদিনমান বাঁধা সেটাও তাদেরই দেওয়া। আরও আছে। ব্যাঙ্কক ট্যুর, সিঙ্গাপুর ট্যুর। সব ফার্মা কোম্পানির পয়সায়।

তিন, তাঁদের ডাক্তারির ঠেলায় বাড়ির লোকজনের প্রাণ ওষ্ঠাগত। ঘরনি অপ্রসন্ন হলে তাঁরা ফুঁসে উঠে বলেন, 'সারা দিনে পাঁচটা চেম্বার, দুটো নার্সিংহোম, চারটে অপারেশন। এ সব কাদের জন্য?' ঘরনি হয়তো মুখের ওপর জবাব দেন, 'সব তোমার জন্য। তিনটে চেম্বার হলেই তো চলে যায়। বাকি দুটো তো আমার আর তাতানের। আমরা কবে পাব তোমায়?

চার, বাড়ির জন্য দু'টো চেম্বার ছেড়ে রাখলে তাঁদের চলে না। তাঁদের ব্যাচমেটরা সবাই কোটি-কোটি টাকার ফ্ল্যাটে উঠে গিয়েছেন। অতঃপর বাদবাকিদেরও সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক কষতে হয়। হাতে ধরা পেনসিলের মতোই পড়ে থাকে তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন।

পাঁচ, তবু মাঝেমাঝে তাঁদেরও বিপদে-আপদে পড়তে হয়। অবস্থা সামাল দেয় তাঁদের আর্থিক প্রতিপত্তি। তাঁদের গলদের গরল গলায় ঢেলে তাঁদের উপভোক্তাদের বলতেই হয়, 'আমরা গরিব মানুষ। আমাদের তো মেনে নিতেই হয়।'

ছয়, ও হ্যাঁ, হিপোক্রিটাসের শপথ বলে একটা বস্তু তাঁদের জীবনের অঙ্গ। লুপ্তপ্রায় অঙ্গের মতো হয়ে কবেই সেটা খসে পড়ে গিয়েছে। নইলে বিবেকযন্ত্রণা হলেও হতে পারত।

সাত, তা বলে তাঁদের জীবন থেকে হুল্লোড় একেবারে হারিয়ে গিয়েছে এমন নয়। বার্মিংহাম থেকে কলকাতায় এসে ব্যাচমেট হয়তো ডুপ্লের টেরেস গার্ডেনে থিম পার্টি দেয়। সেখানে 'আয়াম অ্যান এম বি বি এস' বলে গানবাজনা হতে পারে। হাসির ছলে হলেও সে গানের শেষে ফণা উঁচিয়ে থাকে চাহিদা মাফিক ফিজ না দিলে একে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার অন্তর্লীন জিঘাংসা।

তালিকা দীর্ঘায়িত করব না। 'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'-র অনেক পাঠকের কাছে এ সব কথা দুষ্পাচ্য হতে পারে।

তা বলে 'অলীক সুখ' ডাক্তারদের গণশত্রু বানিয়ে ছেড়েছে এমনটা মোটেই নয়। সাধারণ মানুষের মনে ব্যস্তসমস্ত ডাক্তার ও তাঁদের ডাক্তারির কেতাকায়দা নিয়ে যে সব ধারণা চালু আছে সে সব নিয়ে একটা গল্প বলতে চেয়েছে এই মাত্র। ডা. কিংশুক গুহ এখানে আর পাঁচজনে বিত্তলোভী পাতি বুর্জোয়ার মতো। ধৌত তুলসীপত্র নন। দোষ-গুণের মিশেলে গড়া। কোনও মহানায়কত্ব তাঁর ওপর আরোপ করা হয়নি। এইখানেতেই 'খোকা ৪২০' বা 'বস'-এর চেয়ে 'অলীক সুখ' আলাদা।

তা বলে এথিকসের প্রশ্ন তুলে লজ্জা দেবেন না। এ ধরনের সিনেমায় গল্প জমানোর জন্য, অডিয়েন্সের কপালে খানিক ভাঁজ পড়ানোর জন্য এ সব প্রশ্ন তুলতে হয়। 'অলীক সুখ'-ও তুলেছে। উত্তর দেবার দায় শিল্পের নয়। সমাজের।

অতএব, 'অলীক সুখ'-এর বল এখন সমাজশাস্ত্রীদের কোর্টে। অবশ্যি তাঁরা লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের পায়াভারি হওয়া নিয়ে যতটা উদ্বিগ্ন, পাতি বুর্জোয়া ভুলচুক নিয়ে ততটা নন বলেই শুনি।

এখানেও সেই শ্রেণি সংগ্রাম, বুইল্লেন না?

লেখক পরিচিতি : অংশুমান ভৌমিক, শিক্ষক, শিল্প সমালোচক ও প্রাবন্ধিক।

এবিপি আনন্দের অ্যাঙ্কর টেলিভিশন সাংবাদিক সন্দীপ্তা চট্টোপাধ্যায় চলে গিয়েছেন
২০১২ সালের ২ ডিসেম্বর, মাত্র ৩৪ বছর বয়সে।

সন্দীপ্তা অন্যের জন্য ভাবতে এবং করতে জানতেন।
তাঁকে মনে রেখে মেয়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর এক উদ্যোগ

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

আমার মায়ের কথা

ড. পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

ভয়, উদ্বেগ, আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা। রাজনৈতিক অস্থিরতা। সামাজিক সংকট। সন্তানের ভবিষ্যতের চিন্তা। সমস্যার সমাধান করতে না পারার অক্ষমতা। শিক্ষাগত যোগ্যতা তেমন না থাকার কারণে বাড়ির বাইরে উপার্জনে ও পরিবারের ভরণপোষণে সক্রিয় সাহায্য করতে না পারার গ্লানি।

একটু একটু করে বিষাদের অতলে তলিয়ে যাওয়া এক নারী। সংসারের চিন্তায়, স্বামীর চিন্তায়, ছেলেমেয়ের চিন্তায় রাতের পর রাত ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকেন তিনি। ঘুম আসে না। কিন্তু অন্যরা জানতে পারবে, এই ভয়ে চুপ করে শুয়ে থাকেন। আবার সকালবেলা উঠে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অভিনয় করে যান। রান্না করেন। ছেলেমেয়েকে স্কুলে, কলেজে পাঠান। স্বামীকে অফিসে পাঠান। টিফিনবক্সে দুপুরের খাবার ভরে দিতে ভুল হয় না তাঁর।

কিন্তু সবাই চলে গেলে তিনি দরজা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়েন। নিজে কিছু খান না। খেতে ইচ্ছে হয় না। অবসাদ গ্রাস করে। আতঙ্ক আরও বেশি করে অধিকার করে ফেলে।

একটু একটু করে তাঁর শরীরে বাসা বাঁধে দুরারোগ্য ব্যাধি। পেটে ব্যথা করে। বমি পায়। একটু একটু রক্ত পড়তে আরম্ভ করে। তিনি ভয় পেতে শুরু করেন।

কিন্তু তা-ও তিনি কাউকে কিছু বলেন না। ভাবেন, সেরে যাবে আস্তে আস্তে। কিংবা ভাবেন, বললেই তো সকলকে দুশ্চিন্তায় ফেলা হবে। ডাক্তার, হাসপাতাল করবে সবাই। চিকিৎসা করতে অনেক টাকা খরচ করবে। আসবে কোথায় এত টাকা? ব্যাঙ্ক ব্যালান্স তো শূন্য। ঊষা কারখানায় স্বামীর কাজও তো শূন্যেই ঝুলে আছে। আজ স্ট্রাইক। কাল লক-আউট। পরশু বোমাবাজি। এই তো সে দিন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন বলে কারা যেন স্বামীকে মুখে ঘুঁসি মেরে ঠোঁট ফাটিয়ে দিল। রক্তমাখা ঠোঁট নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন তিনি অনেক রাতে।

ছেলে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় রেজাল্ট ভাল না করতে পেরে একটা সাধারণ কলেজে ভর্তি হল। সেও হতাশায় ভুগছে। এত ভাল ছিল পড়াশোনায় ছেলেটা। সব নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। কলেজে পরীক্ষা হয় না। ক্লাস হয় না ঠিকমতো। পাড়ার কতগুলো বখাটে ছেলে ওকে খারাপ পথে নিয়ে যাচ্ছে। সব বোঝেন তিনি। কিন্তু ছেলে বড় হয়েছে। এখন আর আগের মতো মায়ের কথা শোনে না। ওর বাবাও ওকে আর সময় দিতে পারেন না। বাড়িই থাকতে পারেন না তিনি অর্থ উপার্জনের তাগিদে। তার ওপর, ছেলে রাজনীতি করছে। যে রাজনীতিতে তাঁর কোনও বিশ্বাস নেই। ওই সব নেতারা ওর বাবার আদর্শবাদ ও আত্মত্যাগকে কাজে লাগিয়েছে সারা জীবন। তিনি নিজে কিছুই পাননি। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেছেন সারা জীবন। ছেলেটারও ঠিক তাই হতে চলেছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন তিনি। কবে জেলে টেনে নিয়ে যাবে পুলিশ বা সি আর পি। নয়তো কে বলতে পারে, হয়তো খুন-জখম হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকবে। এত ব্রিলিয়ান্ট একটা ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। শেষ হয়ে যাবে সব আশা-ভরসা। এই জন্যই কি সারা জীবন এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে ছেলেটাকে মানুষ করলেন বুক দিয়ে আগলে?

মেয়েটাও একটু একটু করে বড় হচ্ছে। বয়ঃসন্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও বেড়েছে। স্বামী কাজে চলে যান। ছেলে স্কুলে চলে যায়। মেয়ে বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফেরার সময়ে কতগুলো গুন্ডা প্রকৃতির, অশিক্ষিত ফ্যামিলির ছেলে প্রতি দিন তাকে বিরক্ত করে। কী যে হবে। ভয়-ভাবনায় তিনি কাতর হয়ে পড়েন। একটু একটু করে রোগের উপসর্গ বাড়তে থাকে। যন্ত্রণা বাড়ে। রক্তপাত বাড়ে।

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশের হাজার হাজার মায়ের বোধ হয় একই রকম গল্প। একটু এদিক-ওদিক করে নিলেই মিলে যাবে লক্ষ যুবক-যুবতীর জীবনের গল্পের সঙ্গে। মায়ের গল্প। নয়তো, 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতার গল্প। জীবন যুদ্ধে লড়তে লড়তে নীতার হয়ে ছিল যক্ষ্মা। মনের লড়াই, শরীরের লড়াই করতে করতে, পরিবারের জন্য সবাইয়ের কথা ভাবতে ভাবতে, আর নিজের কথা না ভাবতে ভাবতে, অবহেলা করতে করতে এক দিন নীতা অল্প বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল।

আমার মার হয়েছিল জরায়ু না-কি ডিম্বাশয়ের ক্যানসার। এক দিন যখন যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং তার পর অবিলম্বে আমার বাবা সব কাজ দূরে ছুঁড়ে ফেলে মাকে নিয়ে বড় ডাক্তার দেখালেন, তখন মেটাস্টাসিস হয়ে গেছে। ক্যানসার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। দ্রুত গতিতে, ফর্মাল বায়োপসি রিপোর্ট ছাড়াই আর জি কর মেডিকেল কলেজে অপারেশন করা হল। কিন্তু, ডাক্তার চমকে উঠলেন অবস্থা দেখে। বাবাকে বললেন, এ-কী করেছেন জিতেন' দা? এ তো আর কিছুই করার নেই।

নীতাকে নিয়ে শংকর চলে গিয়েছিল শিলং-এ, বোনকে বাঁচানোর একটা শেষ চেষ্টা করার জন্যে। তারপর একা ফিরে এসেছিল কলকাতায়। আমার মাকে বাবা বাড়ি ফিরিয়ে এনে ছিলেন ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে। না কি জানুয়ারি? ঠিক মনে নেই আর। আমরা জানতাম না মার আসলে কী অবস্থা। বাবা আমাকে আর আমার বোনকে বলেননি। মাও জানত না। ভেবেছিল অসুখ সেরে গেছে। আবার মনের আনন্দে শুরু করেছিল নিজের সংসার। রান্নাঘরে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছিল স্বামী ও সন্তানদের

জন্যে রান্না। মার রান্না ছিল কিংবদন্তী। বাবার বন্ধুরা, আমার বন্ধুরা, আর আমাদের সব আত্মীয়েরা মায়ের রান্না খেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করত।

মা দু'এক সপ্তাহ রান্না করতে পেরেছিল। তারপর আর পারেনি। একদিন আমাকে বলল, দেখো তো, আমার পেটে লাল লাল কী সব দাগ বেরোচ্ছে। আমি দেখলাম। সারা তলপেটে লাল লাল দাগ। আর ফোঁড়ার মতো যেন ফুলে ফুলে আছে। এ আবার কী? এ সব কী?

আমি কী যেন একটা সন্দেহ করে আমাদের পাড়ার ডাক্তারের কাছে ছুটে গেলাম। উনি বললেন, তুই জানিস না? সে কী?

ডাক্তার সিনহা আমাকে জানালেন। মায়ের আয়ু আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ।

এপ্রিল মাসের দু' তারিখে মা চলে গেল। শেষের দু' তিন সপ্তাহ মাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল 'টার্মিনাল ক্যান্সার'-এর অসহ্য-অবিশ্বাস্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে।

দোসরা এপ্রিল, ১৯৭৮ সাল। আমি তখন শেষ পর্যন্ত আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছি। এম এস সি'তে ভর্তি হয়েছি।

চলে যাওয়ার আগে মা জেনে গিয়েছিল সে-কথা। খুশি হয়েছিল খুব।

দিদিমাকে বলেছিল, দেখলে তো ছেলে এম এস সি পড়ছে? জানতাম ও পারবে ঠিক।

দুই

এ-তো গেল আমার ব্যক্তিগত কথা। নিজের কথা বললাম। গভীর কষ্ট আর যন্ত্রণার কথা। বেয়াল্লিশ বছর বয়সে মা চলে গেল। বাঁচাতে পারলাম না। এখনও মনে হয় এই তো সে দিনের কথা। মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে আমাদের সেই মানিকতলার গলিতে রাতারাতি কয়েকশো লোকের ভিড় জমে গেছিল। মনে হচ্ছিল, মা যেন কোনও এক ভি আই পি। পার্থর মা মারা গেছেন, খবরটা যেন ছড়িয়ে পড়েছিল দাবানলের মতো।

অগুণতি মানুষের মিছিলে আমার বন্ধুরা প্রায় সবাই এসে হাজির হয়েছিল কয়েক ঘন্টার মধ্যেই। বাবার বন্ধুরাও। আর কিছু সহকর্মী। সেই জনতার মধ্যে সব চেয়ে লক্ষ করার মতো উপস্থিতি ছিল কাজের মেয়েদের। যে সব দিদিরা আর মাসিরা মায়ের কাছে এত বছর ধরে কাজ করেছে, তারা খবর পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, আমি কেন তাদের আগে কোনও খবর দিইনি।

মা যেন কোনও এক ভি আই পি।

যাই হোক। আর বেশি নিজের কথা নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসে উন্নত মানের ল্যাবরেটরিতে 'হেলথ সায়েন্স' নিয়ে গবেষণা করবার সময়ে পরে জেনেছি এই ধরনের ক্যানসারের কথা। আশ্চর্য লেগেছে জেনে যে আমার মার যে ধরনের ক্যানসার হয়েছিল, তা আসলে সম্পূর্ণ দুরারোগ্য নয়। ঠিক সময়ে যদি ধরা পড়ত, তা হলে চিকিৎসা করে কলকাতাতেই মাকে বাঁচানো সম্ভব হত।

আসলে, ক্যানসারের যে চারটি দশা বা স্টেজ আছে, তাতে মোটামুটি ভাবে দেখা যায় যে ইউটেরাস বা জরায়ুর ক্যানসার, ওভারি বা ডিম্বাশয়ের ক্যানসার, স্কিন ক্যানসার, ব্রেস্ট ক্যানসার ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত কম ভয়ানক। অর্থাৎ কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, এই জাতীয় ক্যানসারগুলো 'স্টেজ ওয়ান' এমনকী 'স্টেজ টু'-এর প্রথম দিকে ধরা পড়লে সার্জারি ও রেডিয়েশন-থেরাপি করে নির্মূল করে ফেলা যায়। মেয়েদের প্রজনন-অঙ্গগুলো সাধারণত অপারেশন করে ডাক্তাররা বাদ দিয়ে দেন। এবং তারপর রেডিয়েশন দিয়ে বা কেমোথেরাপি দিয়ে ম্যালিগন্যান্ট টিসুগুলো সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। এ সবের তুলনায় ব্রেন ক্যানসার, ফুসফুসের ক্যানসার, আর লিভার বা যকৃতের ক্যানসার দুরারোগ্য। প্রধান কারণ হল, এগুলো খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যায়। আর, অপারেশন করাও খুব কঠিন। তাছাড়া আছে লিউকেমিয়া বা রক্তের শ্বেতকণিকার ক্যানসার। আমি অবশ্য দু'চারজনকে এই ক্যানসার নিয়েও বেশ কয়েক বছর বেঁচে থাকতে দেখেছি।

মোদ্দা কথা হল, যে কোনও ক্যানসার যত তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে, ততই চিকিৎসা করার সময় বেশি পাওয়া যাবে ও আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে জীবন দীর্ঘায়িত করা যাবে। কিন্তু, এখানেই আসল সমস্যা। আমার মায়ের মতো যে সব মায়েরা ও বোনেরা আছেন, তাঁরা আমাদের আদিম ও পশ্চাদগামী সমাজ ব্যবস্থায় নিজেদের কথা ভাবতে শেখেননি। তাঁদের বলা হয়েছে, নিজের কথা ভেবো না। শুধু অন্যদের কথা ভাবো।

মেয়েদের সামাজিক অবস্থান ঠিক এখন কোথায়? একটু ভেবে দেখা যাক।

আমাদের দেশে আমরা দেশকে নিয়ে মাতৃপূজা করি। আমাদের বাংলাদেশে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণার পূজো করি। কিন্তু, মেয়েদের স্বাস্থ্য, মেয়েদের শরীর, মেয়েদের বেঁচে থাকার অধিকার—এ সব বিষয়ে আমরা এখনও বোধ হয় সারা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে পিছিয়ে। আমাদের সমাজে যে কোনও অধিকারের প্রশ্নে — সে সামাজিক অধিকারই হোক, রাজনৈতিক অধিকার হোক, আর অর্থনৈতিক অধিকার হোক, পুরুষের দাবি আগে। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের শেখানো হয়েছে, আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। এখানে মেয়েদের সম্পর্কে অনেক বড় বড় কথা বলা হয় বটে, কিন্তু বাস্তব জগতে, আসল কাজের সময়ে নারীর মূল্য সেই শরৎচন্দ্রের কালেই থমকে আছে। সমাজের একেবারে উপরের দিকে কিছু শুভ পরিবর্তন অবশ্যই এসেছে। কিন্তু মিডল ক্লাস ও নিম্নবর্গের সমাজ ও পরিবারগুলোতে সময় মধ্যযুগেই দাঁড়িয়ে আছে। আমরা অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে দেখাতে পারি।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক কিছু সংগঠন, যেমন হিউমান রাইটস ওয়াচ এবং

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশের
হাজার হাজার মায়ের বোধ হয়
একই রকম গল্প। একটু
এদিক-ওদিক করে নিলেই মিলে
যাবে লক্ষ যুবক-যুবতীর জীবনের
গল্পের সঙ্গে। মায়ের গল্প। নয়তো,
'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতার গল্প।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, তাদের বিশদ রিপোর্টে ভারতবর্ষে মহিলাদের সামাজিক ও স্বাস্থ্য-সংকট নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছে। তারা বলেছে, পৃথিবীর সবচেয়ে পশ্চাদগামী দেশগুলোর মধ্যে আমরা রয়েছি। কিন্তু, আমরা যারা দেশের ঘটনাবলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত, আমরা যারা মানবাধিকার আন্দোলনে কাজ করি দেশে ও বিদেশে, আমাদের ও সব রিপোর্ট পড়ার তেমন প্রয়োজন নেই। হয়ত শুধু কিছু স্ট্যাটিসটিক্স কাজে লাগানোর প্রয়োজন আছে।

যাই হোক। আসুন, আবার ফিরে আসি মেয়েদের দুরারোগ্য ক্যানসার ও অন্য স্বাস্থ্য-সংকটের আলোচনায়। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক। নিজের স্বাধীনতা অথবা অর্থ-উপার্জনের ক্ষমতা না থাকার কারণে দীর্ঘমেয়াদী হতাশা, ব্যর্থতাবোধ ও গভীর মানসিক যন্ত্রণা। স্বামী ও সন্তানের ভবিষ্যতের জন্যে তীব্র দুশ্চিন্তা। একটু একটু করে অবসাদের অতলে, চোরাবালির টানে ডুবে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত শরীরে বাসা বাঁধে মরণব্যাধি।

এ সবই জীববিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র আমাদের কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরেছে। ক্যান্সারের ক্ষেত্রে জিন, ডি এন এ এবং আর এন এ একদিকে যেমন, তেমনই অন্য দিকে এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশ এ সব রোগ সৃষ্টি করার জন্যে সমানভাবে দায়ী। প্রকৃতপক্ষে, বলাই হয়ে থাকে যে রোগের বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে জিনে। আর, রোগীর জন্যে প্রতিকূল কিন্তু রোগের জন্যে অনুকূল পরিবেশ অসুখের প্রকাশ ঘটায়।

ক্যানসারের ক্ষেত্রে তিনটি ধাপে রোগ ঘটে। এক, ইনিশিয়েসন বা সূচনা। দুই, প্রমোশন বা বিকাশ। এবং তিন, ম্যানিফেস্টেশন বা বিস্তার।

রোগের ইনিশেয়েসন বা সূচনা ঘটে প্রধানত জেনেটিক প্রিডিসপসিশন হেতু। অর্থাৎ ডি এন এ এবং আর এন এ'র মধ্যে যে অসংখ্য জিন আছে, তার মধ্যে ক্যানসার ঘটাতে পারে এমন যে জিনসমূহ লুকিয়ে আছে, এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশের কারণে সেগুলোর এক্সপ্রেশন বা প্রকাশ ঘটে।

জিন আমাদের শরীরে যা আছে, তা আমরা কোনওভাবেই পাল্টাতে পারব না। বিজ্ঞান চেষ্টা করছে কিন্তু এখনও সেই জায়গায় পৌঁছতে পারেনি। হিউম্যান ক্লোনিং-এর চেষ্টা চলছে শুনেছি পৃথিবীর কিছু উন্নত দেশে। মানবেতর প্রাণীর ক্লোনিং করা সম্ভব হয়েছে। এই ক্লোনিং হয়েছে বিশেষ বিশেষ জিনকে কাজে লাগিয়ে, যাতে এই প্রাণিরা ভবিষ্যতে বিশেষ রোগ বা উপসর্গ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে। কিন্তু, মানব ক্লোনিং বোধ হয় এখনও করা সম্ভব হয়নি। হোমো স্যাপিয়েন্সের—মানব প্রজাতির—ডি এন এ সিকোয়েন্সিং সম্পূর্ণ হয়েছে। বিজ্ঞান এখন জানে, মানুষের শরীরে যে অগুন্তি জিন আছে, সেগুলি কী এবং কী ভাবে সাজানো ও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। এর ফলে এক দিন হয়তো মানব-ক্লোনিং সম্ভব হবে, যদিও তার বিরুদ্ধে নীতিগত প্রশ্ন ও সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জ অনেক আছে।

তা হলে, শরীরে কী কী জিন থাকবে এবং কেমন করে তারা এক অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকবে, তার ওপর আমাদের নিজেদের কোনও নিয়ন্ত্রণ এখনও নেই। ফলে, যে পরিবেশে আমরা বাস করি এবং সেই পরিবেশের যে সব ভারসাম্যহীনতার কারণে সেই লুকোনো জিনগুলো এক্সপ্রেসড বা প্রকাশিত হতে পারে, তাকে যদি কোনও ভাবে আমরা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি, তা হলে ক্যানসারকে আমরা বহুলাংশে কমিয়ে রাখতে পারব।

এখন দেখা যাক আমার মায়ের ক্ষেত্রে পরিবেশ বা এনভায়রনমেন্ট কেমনভাবে রোগের প্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। এই পরিবেশগত কারণগুলি কী?

তিন

এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশ ক্যানসার ও এই জাতীয় মরণব্যাধি সৃষ্টি, বিকাশ ও বিস্তার করার ক্ষেত্রে ক্রিটিক্যাল ভূমিকা গ্রহণ করে। পরিবেশের এই ফ্যাক্টরগুলি নানা প্রকার হতে পারে। সংক্ষেপে কয়েকটি প্রধান বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি।

আমার মাকে যে সব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল, সেগুলোর কথা আগেই বলেছি। একথাও বলেছি যে যদিও আমার মায়ের কথা বার বার এখানে উল্লেখ করছি, এ শুধু একজন নারীর কথা নয়। ভারতবর্ষের, বাংলাদেশের শহরে, উপশহরে ও গ্রামে গ্রামে এমন লক্ষ লক্ষ মা ছড়িয়ে রয়েছেন, এবং একই রকম রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের মধ্যে, সংকটের মধ্যে সারা জীবন কাটাচ্ছেন। আমি নিশ্চিত, যদি তেমন কোনও বড় সার্ভে করা যায়, অসংখ্য পরিবারে আমাদের পরিবারের সেই সময়কার ট্র্যাজেডি খুঁজে পাওয়া যাবে।

এ বার দেখা যাক, এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন বা পরিবেশ-দূষণ কী ভাবে ক্যানসার জাতীয় রোগকে দ্রুত আক্রমণ ও বিস্তারলাভ করতে সাহায্য করে। আমাদের সময়ে কয়লার ব্যবহার খুব বেশি ছিল, যদিও আমাদের বাড়িতে শেষের দিকে রান্নার গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। কিন্তু গ্যাসের দাম তখনই খুব বেশি ছিল, আর এখন তো প্রতিনিয়তই রান্নার গ্যাস ও পেট্রোলের দাম লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। যাই হোক, এই কারণে আমাদের রান্নাঘরে কয়লা ও তার পরে তথাকথিত ধূমহীন কয়লার ব্যবহার খুব বেশি ছিল, এবং আমরা যে মেজেনাইন ফ্লোরে থাকতাম, সেখানে এমনিতেই দমবন্ধ করা অবস্থা ছিল। এর ওপর মশা ও রাস্তার কুকুর এবং তারস্বরে মাইক ও অ্যামপ্লিফায়ার-এর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে আমাদের অনেক সময়ই জানলাগুলো সব বন্ধ করে রাখতে হত। তার ওপর সত্তরের দশকে ছিল কলকাতার ভয়াবহ লোডশেডিং। রাতের পর রাত ঘুম হত না। পাখা নেই। হাওয়া নেই। পাওয়ার কাটের কারণে পাম্প চলে না। ফলে, জলও নেই।

কলকাতার কত ফ্ল্যাট-বাড়িতে এ-রকম অবস্থা আছে? খুঁজে দেখুন। অসংখ্য। আমি নিজে কলেজ স্ট্রিট এলাকায় ও বড়বাজার এলাকায় দেখেছি বহু ফ্ল্যাট-বাড়িতে দিনের বেলাতেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। আলো-হাওয়া কিছুই ঢোকে না।

তার সঙ্গে যোগ করুন রাস্তা থেকে আসা ধূলো ও ধোঁয়া। আমরা যে-পাড়ায় থাকতাম, সেখানে দু'টো গলি ছিল। একটার নাম মদের গলি। সেখান থেকে নানা রকম গন্ধ, উৎপাত ও চিৎকার ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। মারামারি, খুন, জখমও অনেক দেখেছি। এ বার আমরা চলে এলাম কয়েকটা গলি ছেড়ে দিয়ে নতুন ফ্ল্যাটে। এর ঠিক সামনে দিয়ে যে গলি গিয়ে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডে পড়েছে, তার নাম লোকে দিয়েছিল ব্যাটারি গলি। এখানে শিশু শ্রমিকরা পুরনো ব্যাটারি অ্যাসিড দিয়ে ধুয়ে তার ইলেক্ট্রোড রিসাইকেল করত। সে-সব শিশু শ্রমিকরা কত দিন বেঁচেছে, বা কোথায় কী ভাবে আছে, আমি জানি না। কিন্তু জানি, সেখান থেকে ভেসে

আসা তীব্র বিষাক্ত গন্ধে আমাদের বাড়িতে বসেই চোখ জ্বালা করত। নাক টিপে থাকতে হত অনেক সময়ে। সেই সব পুরনো ব্যাটারি থেকে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত ক্ষতিকর ফ্রি রাডিক্যাল—সালফার, কপার, জিঙ্ক, নিকেল এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের কড়া ঝাঁঝালো গন্ধ আমাদের হার্ট, লাং, লিভার ও ব্রেনকে ছোটবেলা থেকেই চিরতরে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়ে গেছে।

আমার মা এই পরিবেশে সারা দিন কাটাতেন। আমরা থাকতাম স্কুলে, কলেজে, অফিস-এ। এই বিষাক্ত পরিবেশে তিনি একটানা কাটিয়েছেন।

তারপর ছিল অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে হতাশা ও অবসাদ, যার কথা আগেই বলেছি। স্বাস্থ্যসম্মত খাওয়াদাওয়া না করা। ঘুমের অভাব। আর আমাদের দেশে ব্যায়াম করা ছেলেদের কাছে হাস্যকর এবং মেয়েদের জন্যে অপরাধ। অন্তত আমাদের সময়ে তাই ছিল। এখনও কি খুব একটা বদলেছে? মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা ব্যায়াম করছেন, বা তাতে পরিবারের সমর্থন ও উৎসাহ আছে, দেখেছেন? দেখলেও বেশি দেখেছেন কি? উচ্চবিত্তদের মধ্যে আছে হয়তো। আর, যে সব মেয়েরা রাস্তায় নেমে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছেন উদয়াস্ত, আমার মায়ের কাছে যে-সব দিদিরা, মাসিরা কাজ করতে আসতেন, তাদের মধ্যে দেখবেন আমার মায়ের যে ধরনের রোগ হয়েছিল, তার প্রকোপ বোধ হয় কম। কারণ, তাঁরা প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম করার কারণে ও তারপর সুনিদ্রার কারণে অনেকাংশে রোগমুক্ত আছেন।

আমার মা আবার শাকসব্জি বেশি খেতেন না। দাম বেশি ছিল না তখনকার দিনে ফলমূলের। তিনি আমাদের দিতেন। কিন্তু নিজে খেতেন না। আমরাও কখনও ভাল করে খোঁজ করে দেখেনি মা নিজে কী খাচ্ছেন।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এই রকমই হয়ে থাকে।

এসব কারণ এখনকার দিনে বিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট করে বলেছেন। যেটা হয়, উপরোক্ত এই সব কারণে শরীরের মধ্যে ইমিউনিটি বা রোগ-প্রতিরোধ করার যে স্বাভাবিক ক্ষমতাগুলো আছে, তার ওপর প্রভাব পড়ে। যে মহিলা খাচ্ছেন না, ঘুমোচ্ছেন না, অবসাদে ভুগছেন, দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন, অর্থ উপার্জন করতে পারছেন না, সামাজিক বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত আছেন, তার সঙ্গে দূষিত পরিবেশের মধ্যে বাস করছেন, খোলা আলো-বাতাস পাচ্ছেন না, এবং কোনও রকম শারীরিক ব্যায়াম করার সুযোগই পাচ্ছেন না, যেখানে হাঁটার কোনও পার্ক নেই, যেখানে শব্দদূষণ ভয়ঙ্কর ভাবে গ্রাস করছে প্রতিদিন, যেখানে গাছপালা নেই, সবুজ নেই, সেখানে একজন নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি ভারতীয় নারীর দেহের জিন এবং তার ডি এন এ-আর এন এ এই ভয়ঙ্কর প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে জরায়ু, ওভারি ক্যানসার-এর সূচনা করবে, এতে আশ্চর্যের কী আছে?

আমাদের এখানে মার্কিন মেয়েরা কেমন ভাবে বেঁচে আছে? একটু তুলনা করে দেখা যাক।

চার

আমেরিকান মেয়েদের স্বাধীনতা ও সম্পূর্ণ ভয়হীনভাবে চলে ফিরে বেড়ানোর যে সামাজিক অনুমোদন আছে, আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে লজ্জা পেতে হয়। সামাজিক স্বাধীনতা এবং সমানাধিকার তো আছেই। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, এবং বিশেষ করে আমেরিকার যেটা সবচেয়ে চোখে পড়ে, তা হল ব্যক্তিগত অধিকার। গোপনীয়তার অধিকার। যেখানে খুশি, যখন খুশি চলে যাওয়ার অধিকার। এ সব কারণে এ দেশটা আমাদের দেশের থেকে মেয়েদের ক্ষেত্রে বহু দূর এগিয়ে গেছে।

যে কোনও মেয়ে পনেরো কি ষোল বছর বয়েস হলেই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোনও জায়গায় পড়াশোনা করতে চলে যাচ্ছে। হাই স্কুলে পড়তে পড়তেই অনেক মেয়ে তাদের বয়ফ্রেন্ড নির্বাচন করে ফেলে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাকেই শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে। আমাদের দেশে অনেকেরই ধারণা, আমেরিকায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই যে অবাধ মেলামেশার সুযোগ আছে, সেটা একটা চরম উচ্ছৃঙ্খলতা এবং যৌন স্বেচ্ছাচার। মোটেই তা নয়। প্রকৃতপক্ষে, আমার নিজের অভিজ্ঞতা হল, আমেরিকান কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীর মধ্যে রক্ষণশীলতা এখন অনেক বেশি। সত্তরের দশকে এ দেশে যে মুক্ত সেক্স-এর প্লাবন এসেছিল, এখন তা অনেকটাই স্তিমিত। যদিও আমাদের দেশের তুলনায় এখানে মুক্ত যৌনতা ও অবাধ মেলামেশার সুযোগ অনেক বেশি। সেটার ভাল-খারাপ দুটো দিকই আছে। আমাদের দেশের ভয়ঙ্কর পুরুষতান্ত্রিকতা এ দেশের মেয়েরা কল্পনাও করতে পারে না।

খেলাধূলার ক্ষেত্রেও আমেরিকার মেয়েরা আমাদের দেশের থেকে অনেক দূর এগিয়ে। কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েরা এক ধরনের স্পোর্টসে, আর শ্বেতাঙ্গ মেয়েরা আর এক ধরনের খেলায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছে। এর কারণও সামাজিক অনুমোদন, এবং সমানাধিকারের একটা তীব্র, বহমান স্রোত। একেবারে প্রাইমারি স্কুল থেকে কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়াকে কারিকুলামের মধ্যে যুক্ত করা আছে। অ্যাথলেটিক্স, বাস্কেটবল, সাঁতার, এবং আমেরিকায় এখন মেয়েদের ফুটবল বা সকার ভীষণ জনপ্রিয়। আপনি হয়তো পড়াশোনার কয়েকটি বিষয় বাজেটের কারণে কাটছাঁট করতে পারেন, কিন্তু খেলাধুলোয় হাত দিতে কোনও কলেজ কর্তাই সহজে রাজি হবেন না। এ সব কারণে আমেরিকার মেয়েদের স্বাস্থ্য আমাদের দেশের সাধারণ ঘরের মেয়েদের স্বাস্থ্যের থেকে অনেক ভাল।

সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল, এই যে মেয়েরা কী পরে রাস্তায় জগিং করছে, বা কোন পোশাক পরে কলেজ বা স্কুলে যাচ্ছে, তাই নিয়ে কেউ বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। এখানে আমি আমার নিজের ছাত্রীদের যে পোশাক পরে ক্লাসরুমে ঢুকতে দেখেছি, আমাদের দেশে হলে আমাদের বড় বড় নেতা ও নেত্রীরা হয় মূর্চ্ছা যেতেন, গ্রামের দিকে হলে হয়ত পঞ্চায়েতে ডেকে তার বিচার, জরিমানা ও নির্বাসন করতেন। আর, অনেক দেশেতো পাথর ছুঁড়ে মেরেই ফেলা হত।

আমার মনে আছে, আমি তখন বাসন্তী-গোসাবার এক কলেজে অধ্যাপনা করি। এক হোটেলে রাত কাটানোর 'অপরাধে' একবার পঞ্চায়েত ডেকে

বিশেষ করে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা জাতীয় মানবাধিকারের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অগ্রগণ্য দেশগুলোর মধ্যে আমেরিকা অনেকটাই পিছিয়ে। ‘ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স’ও খুব বেশি উপস্থিত।

এক প্রেমিক ও প্রেমিকার বিচারসভা বসলো গ্রামে। প্রেমিক-প্রবরকে কিছু ধমক-ধামক দিয়ে ও বোধ হয় কিছু জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হল। আর, মেয়েটিকে কলেজ থেকে চির-নির্বাসিত করা হল। বেশি দিনের কথা নয়। তখন সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত বামফ্রন্টের। আর, কলেজ স্টুডেন্ট ইউনিয়ন কংগ্রেসের। নিজের চোখে দেখা।

যাই হোক সে সব আলোচনা আবার পরে করা যাবে।

এই স্বাধীনতার কারণে আমেরিকার মেয়েরা দাম্পত্য-জীবনের ক্ষেত্রেও তীব্র সমানাধিকার দাবি করেন, এবং সমাজও তাঁদের সে-স্বীকৃতি দিয়েছে। যদিও সাধারণ মার্কিনিরা রক্ষণশীল এবং যাকে বলে ট্রাডিশনেই বিশ্বাস করেন, এবং মোটামুটিভাবে সন্তানপালন, গৃহকর্ম ইত্যাদি কাজ মহিলারাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে করে থাকেন, কিন্তু তাঁদের সে-কাজ বাধ্যতামূলকভাবে করিয়ে নেওয়া হয় না। এবং, যে কোনও সময়ে মহিলারা নিজের ইচ্ছে মতো বাড়ির বাইরে যেতে পারেন, গাড়ি চালিয়ে বন্ধুর বাড়ি যেতে পারেন ও যতক্ষণ খুশি থাকতে পারেন। স্বামীর কাছে, শ্বশুর-শ্বাশুড়ির কাছে কোনও জবাবদিহি করতে হয় না।

বলতে গেলে, কোনও মার্কিন দম্পতি শ্বশুর-শ্বাশুড়ির সঙ্গে তেমন কোনও যোগাযোগই রাখেন না। যাই হোক, তার আবার ভাল-মন্দ দুটো দিকই আছে।

যে সব মহিলারা আজকে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে চাকরি-বাকরি করছেন, তাঁরা তাঁদের স্বামী বা জীবন-সঙ্গীর সাথে এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে বাড়ির কাজকর্ম দুজনে মিলেই ভাগ করে করা যায়। অর্থাৎ, আমাদের দেশের মতো চাকুরিজীবি মেয়েরা চাকরিও করবেন, আবার বাড়ি ফিরে এসে রান্নাও করতে হবে, আর সেই সময়ে স্বামীপুঙ্গব টিভি চালিয়ে খেলা বা পলিটিক্স দেখবেন, তা চলে না।

এই সব অনেক কারণে আমেরিকার মেয়েরা স্বাস্থ্যের দিক থেকে আমাদের দেশের সাধারণ ঘরের মেয়েদের তুলনায় অনেক ভাল অবস্থায় আছেন, এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

কিন্তু, আমি বললাম আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় যাঁরা একটু ভাল অবস্থায় আছেন, তাঁদের কথা। সেখানেও দেখা যাবে, যে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে—বিশেষ করে সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, জার্মানি এবং আমেরিকা মহাদেশের ক্যানাডা—এ সব জায়গায় মেয়েদের অবস্থা আরও অনেক ভাল। বহু ক্ষেত্রে আমেরিকা এ সব দেশগুলোর তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। বিশেষ করে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা জাতীয় মানবাধিকারের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অগ্রগণ্য দেশগুলোর মধ্যে আমেরিকা অনেকটাই পিছিয়ে। ‘ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স’ও খুব বেশি উপস্থিত। কিন্তু, আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে এ দেশের মেয়েদের অনেকটা এগিয়ে রাখতেই হবে। কিন্তু এ দেশেও যাঁরা খুব গরিব, সেই লক্ষ লক্ষ মেক্সিকান, আফ্রিকান বা ভারতীয় উপমহাদেশের থেকে আসা ইমিগ্র্যান্ট মেয়েদের মধ্যে স্বাস্থ্য-সঙ্কট এক তীব্র আকার ধারণ করেছে। সেখানেও যেন ঠিক আমার মায়ের মতো আর্থ-সামাজিক অবস্থা। হতাশা, অবসাদ, দারিদ্র। আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটানো। স্বামী কাজ থেকে ঠিকমতো ফিরে আসবেন কি না, সে ভাবনায় ঘুম নেই। কালকে পুলিশ বা ইমিগ্রেশন এজেন্টরা বন্দুক হাতে এসে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাবে কি না, সেই ভয়ে শুকিয়ে যাওয়ার অবস্থা। এঁদের মধ্যে এবং আমেরিকার অনগ্রসর ও অতি-রক্ষণশীল অঞ্চলগুলোতে - যেমন মিসিসিপি, সাউথ ক্যারোলিনা, টেক্সাস, আলাবামা, জর্জিয়া, ডাকোটা, পশ্চিম ভার্জিনিয়া— মেয়েরা অনেক পিছিয়ে আছেন। সেখানে একে তো ঐতিহাসিক কারণে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের সমস্যা আজও তীব্র। কাগজে - কলমে সমানাধিকার থাকলেও বাস্তবে বহু ক্ষেত্রেই কালো ছেলেমেয়েরা বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার।

আবার লিবারেল, উন্নত, অগ্রসর নর্থ-ইস্ট রাজ্যগুলো— যেমন আমাদের নিউ ইয়র্ক, বা নিউ জার্সি, কানেক্টিকাট, ম্যাসাচুসেটস, নয়তো পশ্চিমের ক্যালিফোর্নিয়া— এসব জায়গাতেও প্রচুর অবসাদ ও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে। মেয়েদের ওপর অত্যাচারের ঘটনাও প্রচুর। যদিও আমাদের দেশের তুলনায় হয়তো সংখ্যায় কম। হয়তো এখানে পুলিশ ও প্রশাসন আরও একটু বেশি সক্রিয়। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপ এমনকী ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর তুলনায় এ সব দিকেও আমেরিকার মেয়েরা এবং মার্কিন সমাজ অনেক পিছিয়ে আছে।

দুশ্চিন্তা ও অবসাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয় ও স্ট্রেস মেয়েদের শেষ করে দিচ্ছে। এখন আরও বেড়ে চলেছে এই নয়া-ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও সামাজিক বৈষম্যের কারণে। আমেরিকার এই সব পিছিয়ে-পড়া অঞ্চল ও সমাজগুলোর সঙ্গে আমাদের উত্তর কলকাতার মানিকতলা, সত্তর দশকের খুব একটা তফাত নেই। যেখানেই বৈষম্য, উদাসীনতা, সমান অধিকার, শিক্ষার অধিকার, কাজের, উপার্জনের অধিকার, স্বাস্থ্যের, সু-পরিবেশের অধিকার নেই, সেখানেই মেয়েরা দুরারোগ্য ক্যানসার বা টিবি অথবা অন্য কোনও খারাপ অসুখের শিকার হচ্ছেন।

এই মার্কিন মেয়েদের সঙ্গে বেয়াল্লিশ বছর বয়েসে চলে যাওয়া আমার মা এবং মেঘে ঢাকা তারার নীতার গল্পের খুব একটা তফাত নেই।

লেখক পরিচিতি : ড. পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মী।

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েরা

মা ও শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষায় সরকারি প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি, নিরাপদ মাতৃত্বের হাজারো আশ্বাস...। কিন্তু কেমন আছেন রাজ্যের মায়েরা, মেয়েরা? লিখছেন **সোমা মুখোপাধ্যায়।**

দিন কয়েক আগে কলকাতার এক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রসূতিবিভাগ থেকে বেরনোর সময়ে নজর পড়েছিল ওয়ার্ডের বাইরে ঝোলানো মস্ত পোস্টারটার দিকে। মা ও শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষায় সরকারি প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি সেখানে। নিরাপদ মাতৃত্বের হাজারো আশ্বাস। সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামের একজন মাকেও যাতে অকালে চলে যেতে না হয়, সে জন্য সরকারি বন্দোবস্তের ঢালাও প্রচার নজরে পড়ছে নানা জায়গাতেই।

কলকাতায় বসে নিরাপদ মাতৃত্বের কথা ভাবা না হয় কিছুটা সম্ভব। কিন্তু গ্রামের ছবিটা? একেবারে সাম্প্রতিক কিছু অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে।

গ্রামের নাম খাটিয়াকানা। মালদহের পঞ্চানন্দপুর ঘাট থেকে নৌকায় ঘণ্টা-দুয়েক পথ। তারপরে হেঁটে দু'কিলোমিটার। নদী ভাঙনে বে-ঘর হওয়া বহু পরিবারের বাস এই গ্রামেই। এখানকারই বাসিন্দা মিনতি মণ্ডল। সদ্য প্রসব হওয়া মিনতির রক্তক্ষরণ আর থামছিলই না। গর্ভাবস্থায় অপুষ্টির সমস্ত চিহ্ন বহন করে হাড় জিরজিরে যে শিশুটিকে মিনতি পৃথিবীতে এনেছিলেন, তার চেয়েও তাঁর নিজের জীবন বেশি বিপন্ন ছিল। গ্রামের প্রশিক্ষণহীন দাইয়ের একের পর এক টোটকাও যখন ক্ষরণ বন্ধ করতে পারল না, তখন মিনতিকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটলেন এলাকারই চার যুবক।

কী ভাবে? প্রথমে একটা খাটিয়ায় তাঁকে শুইয়ে দুদিকে লম্বা করে বাঁশ বাঁধা হল। তারপরে সেই খাটিয়া নিয়ে তাঁরা ছুটলেন দু' কিলোমিটার দূরের ঘাটে। ঘন্টা দেড়েক অপেক্ষার পর নৌকা এল। নৌকায় চাপিয়ে মোথাবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের আর পাঁচটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো মোথাবাড়িতেও তখন ডাক্তার ছিলেন না। ছিলেন না কোনও নার্সও। তাই ১৩ কিলোমিটার পথ খাটিয়া নিয়ে দৌড়ে গিয়ে তাঁরা পৌছলেন মালদহ জেলা হাসপাতালে। সেখানে মিনতি যখন ভর্তি হলেন, তখন খাটিয়ার চাদর রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

মিনতিকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায়নি। আর বলে রাখা ভাল, মিনতি বা তাঁর মতো আরও অনেকের মৃত্যু প্রশাসনের চোখ খুলে দিতেও পারেনি। খাটিয়াকানা আছে খাটিয়াকানাতেই!

খাটিয়াকানা, হারুটোলা, দক্ষিণ পলাশগাছি, খাট্টিখোলা, পরাণপুর, কাঁচি যদুপুর, পিয়ারপুর সর্বত্রই এই মরিয়া লড়াইয়ের ছবি। এখানে স্কুল নেই। স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। হয় ভিন শহরে দিনমজুর খাটতে যাওয়া, নয়তো বিড়ি বাঁধা—এ ছাড়া অন্য কোনও কাজও নেই। শেষ কবে দু'বেলা পেট ভরে খেয়েছেন তা জানতে চাইলে মনে করতে পারেন না প্রায় কেউই। এখানকার বাসিন্দাদের নিয়ে আসলে কারওরই কোনও মাথাব্যথাই নেই। গ্রামের বৃদ্ধ মোড়ল বললেন, ''বিনা চিকিৎসায় একদিন গ্রামটা শেষ হয়ে যাবে...।'' তাঁর কথাগুলো শোনায় অনেকটা আর্তনাদের মতো।

ফুলহার নদীর এক দিকে রুইমারি, অন্য দিকে বিলাইমারি। এক সময় এই দুই গ্রাম ছিল পাশাপাশি, ভাঙনের জেরে সরতে সরতে এখন নদীর দু'প্রান্তে। রতুয়া বিধানসভার অন্তর্গত রুইমারিতে ৩০০ পরিবারের অধিকাংশই বছরের অর্ধেক দিন অনাহারে থাকেন। কথা শুরু করতেই এক প্রৌঢ়া চিৎকার করে ওঠেন, ''ভোটের আগে নেতারা এসে বলেন, 'বিদ্যুৎ দেব। হাসপাতাল দেব। পেটের ভাত দেব।' আমাদের তো তেষ্টার জলটুকুও জোটে না।'' যক্ষ্মারোগী, ২০ বছরের মফিজুল হক বললেন, ''ভাঙনের পর এই নদীর জলে কত লাশ ভেসে যায়। সেই জলই আমরা খাই। আর তাই প্রতি বছর ডায়েরিয়ায় গ্রামের বহু লোক মারা যায়। গ্রামের মেয়েরা বাচ্চা হতে গিয়ে একের পর এক মরে যায়। কেউ খবরই রাখে না।''

মালদহের এই গ্রামগুলো থেকে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি, ভগবানগোলা, বামনাবাদের ভৌগোলিক দূরত্ব যা-ই হোক, জীবনের গল্পগুলো অনেকটাই এক। ৩০ বছর আগে সুনীতি শীলের বিয়ে হয়েছিল এক সম্পন্ন কৃষক পরিবারে। ৩০ বছর পরে আজ সুনীতি থাকেন খড়ে ছাওয়া এক চিলতে ঘরে। সেটাও নিজের নয়। বছরে ৬০০ টাকার লিজ। পদ্মার ভাঙনে স্বচ্ছল পরিবারের গৃহবধূ থেকে এক ধাক্কায় সর্বস্বান্ত পরিবারের বউ। সুনীতির মেয়ে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা গিয়েছেন মাস কয়েক আগে। প্রসব হচ্ছিল গ্রামের দাইয়ের কাছে। নানা জটিলতা দেখা দেওয়াও দাই পিঠটান দেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু অত দূরের পথ যাওয়ার আগেই সুনীতির মেয়ের মৃত্যু হয়।

সামসুন্না বিবির গল্পটা আবার একটু আলাদা। বারবার সাংবাদিকের ডায়েরিতে নিজের নাম লেখাতে চাইছিলেন সামসুন্না। হার্টের অসুখে ভুগছেন দীর্ঘদিন। কোলে পাঁচ মাসের মেয়ে। জন্মের পরপরই তারও হার্টের অসুখ ধরা পড়েছে। টাকা কোথায় যে চিকিৎসা করাবেন? তাই কবে সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী তাঁদের গ্রামে আসবেন সেই ভরসায় বসে রয়েছেন সামসুন্না। অচেনা যে কোনও মানুষকে দেখলেই সরকারি প্রতিনিধি ভেবে নেন এই তরুণী। বিড়বিড় করতে থাকেন, ''নামটা লিখে নিন। তা হলে ওষুধটা পাব।''

একই ছবি পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও। কেশরগড়িয়া গ্রামের স্বপ্না

মাহাতোর মেয়েটা জন্ম থেকেই ভুগছে। পাঁচ মাসের মেয়েটার ফুসফুসের রোগ ধরা পড়েছে। গ্রামীণ হাসপাতালের ডাক্তার বলেছিলেন মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে। কিন্তু যাতায়াতের খরচটুকু বহন করার সামর্থ্যই নেই তাঁদের। কী হবে তা হলে? ''এই ভাবে এক দিন কোলেই মরে যাবে মেয়েটা। আমরা কিচ্ছু করতে পারব না।''

প্রসবের পরে রক্তক্ষরণ আর থামছিল না সামসুদার। মুর্শিদাবাদের এক গ্রামীণ হাসপাতালের ডাক্তাররা বুঝতে পারছিলেন অবিলম্বে সামসুদাকে রক্ত দেওয়া দরকার। কিন্তু সবচেয়ে কাছের ব্লাড ব্যাঙ্কটাই ৩০ কিলোমিটার দূরে। সেখানে রোগিণীর রক্তের নমুনা সমেত কাউকে পাঠানো, রক্তের গ্রুপিং, ক্রস ম্যাচিং, রক্ত নিয়ে ফিরে আসা, এ সব কিছু হতে হতে সাত থেকে আট ঘণ্টা পেরিয়ে যাবে। তবু ছুটেছিলেন সামসুদার স্বামী। রক্তের ব্যাগ হাতে তিনি যখন ফিরলেন, তার ঘণ্টা চারেক আগেই তাঁর স্ত্রী মৃত্যু হয়েছে। সামসুদার সন্তানেরও জন্মের পর-পরই প্রবল শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছিল। নীল হয়ে গিয়েছিল গোটা শরীরটা। ঘণ্টা চারেকের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।

রক্তক্ষরণ শুরুর পরে মাত্র দু'ঘণ্টা। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটাই হল 'গোল্ডেন আওয়ার'। প্রসবজনিত রক্তক্ষরণ থামতে না চাইলে দু'ঘণ্টার মধ্যে প্রসূতিকে রক্ত দেওয়াটা জরুরি। তা না হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অধিকাংশ স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং গ্রামীণ হাসপাতালে রক্তের ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি দিন বহু মায়ের মৃত্যু হয়। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে 'ব্লাড স্টোরেজ ইউনিট' ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেও বাস্তবে তা এখনও সত্যি করে তুলতে পারেনি স্বাস্থ্য দফতর।

স্বাস্থ্য দফতরের 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এক্সপার্ট গ্রুপ'-এর চেয়ারম্যান, চিকিৎসক সুব্রত মৈত্র স্বীকার করে নিয়েছেন, বহু জেলাতেই 'ব্লাড স্টোরেজ ইউনিট' নেই। তাই রোগীদের ভোগান্তি চরমে। এমন সমস্ত এলাকার নাম নথিভুক্ত করে সর্বত্র নয়া ইউনিট খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের সহ অধিকর্তা শিখা অধিকারী জানিয়েছেন, বড় ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোর সঙ্গে 'ব্লাড স্টোরেজ ইউনিট'গুলোকে জুড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছেন তাঁরা। নেগেটিভ, পজিটিভ মিলিয়ে প্রতিটি কেন্দ্রে ১০ ইউনিটের মতো রক্ত থাকবে। প্রত্যেক কেন্দ্রে থাকবেন একজন করে চিকিৎসক এবং টেকনিশিয়ান।

কিন্তু সরকারি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নে আঠেরো মাসে বছর তা কে না জানে! জননী সুরক্ষা যোজনায় প্রসব সংক্রান্ত খরচ পাওয়ার ব্যবস্থা কিংবা বাড়ি থেকে হাসপাতালে পৌঁছনোর 'নিশ্চয় যান' (অ্যাম্বুল্যান্স) -এর ব্যবস্থা করতেও কালঘাম ছুটে যায় অনেকেরই।

নদীয়ার হাঁসখালির সরমা মান্না মারা গিয়েছিলেন প্রসব হতে গিয়ে। আট মাসের মাথায় তাঁর কিছু জটিলতা দেখা দেয়। স্থানীয় ডাক্তার বলেছিলেন, শহরে নিয়ে যান, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করানো দরকার। সরমার বাড়ির লোকেরা তেমন ব্যবস্থা করতে পারেননি। গ্রামেও আলট্রাসোনোগ্রাফির ব্যবস্থা ছিল না। এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গ্রামে একটি কেন্দ্র গড়ে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি যন্ত্র বসানোর জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিল বছর খানেক আগে। সেই আবেদনের পরে সরকারি প্রতিনিধিরা সব কিছু পরিদর্শন করে গিয়েছেন। কিন্তু অনুমতি মেলেনি। কেন মেলেনি? স্বাস্থ্যভবনের কর্তারা গম্ভীর মুখে জানিয়েছেন, আলট্রাসোনোগ্রাফি নিয়ে প্রচুর দুর্নীতি চলছে। বহু জায়গায় চলছে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের মতো বেআইনি কাজও। তাই তাঁরা সতর্ক হয়ে গিয়েছেন। জেলায় জেলায় এমন অনেক প্রকল্পের অনুমোদন তাই আটকে রয়েছে।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, বেআইনি কিছু হলে তা দেখা এবং তার পরে তা প্রতিকারের দায়িত্ব তো প্রশাসনের। কিন্তু সেই অজুহাতে নিছক সন্দেহের বশে কোনও প্রকল্পের অনুমোদন আটকানো হবে কেন? যে দায়িত্ব সরকার একা বহন করতে পারছে না, কেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর সঙ্গে তা ভাগ করে নেওয়া হবে না? যথারীতি এই প্রশ্নের কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

কোথাও প্রসবের যথাযথ বন্দোবস্ত নেই, আবার কোথাও বা প্রসবের পরে রুগ্ন সন্তান জন্মালে তার চিকিৎসার পরিকাঠামো নেই। কাগজে-কলমে জেলায় জেলায় 'সিক নিউবর্ন ওয়ার্ড' চালু করেছে স্বাস্থ্য দফতর। কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের একটা বড় অংশের কাছে তা এখনও অধরা। কোথাও আবার এসএনসিইউ (সিক নিউবর্ন ইউনিট)-এ পৌঁছে দেখা যায় সেখানে ঝাঁ চকচকে বাড়ি আর দামি সরঞ্জাম রয়েছে ঠিকই, কিন্তু ডাক্তার নেই। তাই কাজের কাজ কিছু হয় না।

কেন পরিকাঠামো না তৈরি করেই একের পর এক কেন্দ্র খুলছে সরকার, সে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। কারণ রাজনীতির অঙ্কে সংখ্যাবৃদ্ধিটাই সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। আর তাই কলকাতায় বসে 'নিরাপদ মাতৃত্ব' এর পোস্টার দেখে রাগ, ক্ষোভ, বিবেক দংশন যা-ই হোক না কেন, হতাশার ছবিটা বদলে দিতে তা বিশেষ সাহায্য করতে পারে না।

লেখক পরিচিতি : সোমা মুখোপাধ্যায়, প্রাবন্ধিক।

ADVERTISEMENT

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।

যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

ভারতে মাতৃমৃত্যুর হার

একটি জাতীয় লজ্জা

গর্ভধারণ ও শিশুর জন্ম দেওয়া কোনও রোগ নয়, স্বাভাবিক একটি শারীরিক ঘটনা। কিন্তু সেই স্বাভাবিক ঘটনার পরিণতিতে জন্মদাত্রী মারা যাবেন, এটা আমাদের দেশে এখনও কিছু কিছু সময়ে স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া হয়। দেশের যে সব মানুষ এখনও উন্নয়নের প্রসাদবঞ্চিত, তাঁরা এই অঘটনকে একবিংশ শতকে বসেও ললাটলিখন বলে মেনে নিতে বাধ্য হন। অথচ সামান্য প্রচেষ্টা আর অল্প মমত্ব দিয়ে চিত্রটি বদলে দেওয়া যায়— লিখছেন **ডা. কাঞ্চন মুখার্জি।**

"শিশুর জন্ম দিয়ে মারা গেলেন মা, দিল্লি নির্বিকার"। হিন্দুস্তান টাইমস-এর (২৯ আগস্ট ২০১০) খবরটির বঙ্গানুবাদ করলে এই রকমই কিছু দাঁড়ায়। দিল্লীর প্রাণকেন্দ্র কনট প্লেসের পাশেই ব্যস্ত জনবহুল শঙ্কর মার্কেটের ফুটপাথে এক আশ্রয়হীন প্রসূতি তাঁর শিশুর জন্ম দিলেন—কয়েক হাজার মানুষ তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন, কিন্তু লাল কাপড়ে ঢাকা ন্যাকড়ার বান্ডিলটির মধ্যে কী ঘটছে, সেটা কেউ ফিরেও দেখলেন না। মা তাঁর শিশুর জন্ম দিলেন, একেবারেই একা, বিনা সাহায্যে। সদ্যোজাতের কান্নার শব্দে কয়েকজন স্থানীয় দোকানদার এসে দেখলেন, শিশুকে ঘিরে পাক খাচ্ছে রাস্তার নেড়ি কুকুরের দল। একটি কাপড়ের দোকানের ভদ্রলোক বাচ্চাটিকে তুলে নিলেন। আপাতদৃষ্টিতে মা কোনও সাহায্য নিতে চাননি, যেখানে জন্ম দিয়েছেন সেইখানেই চার দিন বাদে মারা গেছেন। পুলিশ এসে তাঁর মৃতদেহ সরিয়ে শিশুটিকে পালক মা-বাবার কাছে (নাকি অনাথ আশ্রমে?) পাঠিয়ে দিয়েছে।

দু'টো কথা বোঝা যাচ্ছে। দ্বিতীয় কথাটা প্রথমে বলি। মানুষ উদাসীন, তার নিজের চক্করে এতই ব্যস্ত যে আশপাশে কে মরল আর কে বাঁচল সেটা দেখার ফুরসত নেই। আমরা আমাদের দেখার চোখ আর ভাবার বোধ হারাচ্ছি, কে আর ঝামেলায় জড়াতে চায় ঝুটমুট। ভয় হয়, যতটুকু সময়, অর্থ আর মমতা আমার দেওয়ার ইচ্ছে, তার চাইতে বেশি দিতে যদি বাধ্য হই! সুতরাং আমরা তাকাই কিন্তু দেখি না, ঘাড় ফিরিয়ে অন্যমুখো হাঁটি। আর প্রথম কথাটা এই—যখন আমরা বিশ্বে অর্থনৈতিক মহাশক্তিধর (হয়তো বা!) আর মিডিয়া পৃথিবীর ধনীতম মানুষদের মধ্যে থাকা গুটিকয় ভারতীয় মুখের স্তবগানে কল্লোলিত, ঠিক তখনই আমাদের লক্ষ লক্ষ মা সবার অলক্ষ্যে শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে মারা যাচ্ছেন, মাতৃমৃত্যুর খতিয়ানে আমরা বিশ্বে 'এগিয়ে' রয়েছি।

দিল্লির শঙ্কর মার্কেটের ফুটপাথের শিশুজন্মটা অবশ্যই এক চূড়ান্ত উদাহরণ। কিন্তু চূড়ান্ত হলেও, বা চূড়ান্ত বলেই হয়তো, এইটা আমাদের দেশের সত্যি অবস্থাটা এক ঝলকে দেখিয়ে দেয়, একবিংশ শতকের 'মেরা ভারত মহান' মুখ ঢাকে লজ্জায়। আমাকে সেই লজ্জার আখ্যান আজ লিখতে হবে, আঁকতে হবে ভারতে শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে মায়ের মৃত্যুর চালচিত্র, আর তার সঙ্গে অবধারিতভাবে চলে আসা আরও কিছু কথা।

মাতৃমৃত্যু-হার ব্যাপারটা কী?

মাতৃমৃত্যু-হার (Maternal Mortality Ratio, MMR) হল এক লক্ষ জীবিত শিশুজন্ম-পিছু ক'জন মা মারা গেলেন, সেই সংখ্যা। তবে সেই মৃত্যুগুলোকে গর্ভধারণ ও প্রসব এবং তার জন্য নেওয়া ব্যবস্থা (বা অব্যবস্থা) জনিত কারণে হতে হবে, আকস্মিক কারণে গর্ভবতী মায়ের মৃত্যু এই হিসেবে ধরা হবে না। আর প্রসূতি অবস্থায়, বাচ্চার জন্মের সময়ে, গর্ভপাতের সময়ে, গর্ভপাত বা বাচ্চা জন্মের ৪২ দিনের মধ্যে গর্ভধারণ ও প্রসবজনিত সকল কারণে মৃত্যুই সেই বছরের মাতৃমৃত্যু-হারের হিসেবে আসবে। কত

দিন গর্ভধারণ করে মৃত্যু হয়েছে সেটা কোনও ধর্তব্য বিষয় নয়। মাতৃমৃত্যু-হার যে কোনও দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা কতটা ভাল বা মন্দ তার এক গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

মৃত্যুর কারণ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) তার ২০০৫ সালের রিপোর্ট ''প্রতিটি মা ও শিশু মূল্যবান'' (Make Every Mother and Child Count) প্রকাশ করে জানায়, মাতৃমৃত্যুর প্রধান কারণ হল প্রসবকালীন অতিরিক্ত রক্তপাত (২৫%), বিভিন্ন ধরণের সংক্রমণ (১৩%), হাতুড়ে পদ্ধতিতে গর্ভপাত ঘটানো (১৩%), এক্লামসিয়া বা গর্ভকালীন রক্তচাপ বৃদ্ধি ও খিঁচুনি (১২%), প্রসবের সময়ে বাচ্চা মায়ের জন্মপথে আটকে যাওয়া (৮%), অন্যান্য গর্ভধারণ ও প্রসব সম্পর্কিত কারণ (৮%); ও পরোক্ষ কারণ (২০%)। পরোক্ষ কারণ বলতে ম্যালেরিয়া, অ্যানিমিয়া, এইচ-আই-ভি / এইডস্, ও হৃদযন্ত্র-রক্তসংবহনতন্ত্রের রোগ; এরা সবাই গর্ভাবস্থাকে অসুবিধেয় ফেলতে পারে এবং গর্ভাবস্থার ফলে বেড়ে যেতে পারে। বিশ্বের মাতৃমৃত্যুর শতকরা নব্বই ভাগ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ঘটে, আর তার প্রধান কারণ প্রসবকালীন অতিরিক্ত রক্তপাত।

ঝুঁকি বাড়ে কীসে?

প্রথমেই বলতে হয়, মায়ের পুষ্টি ঠিকঠাক না হলে আর তিনি প্রসবের সময়ে যথাযথ চিকিৎসাব্যবস্থার সুযোগ না পেলে মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে। দক্ষ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসাকর্মীর নাগাল পাওয়াটা একটা বড় ব্যাপার। চিকিৎসাস্থলটি যদি অনেক দূরে হয়, সবাই তার সুযোগ নিতে পারে না। প্রসবের সময়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছনো তা হলে মুশকিল, তা ছাড়া গর্ভাবস্থায় সময় ও অর্থ খরচ করে সেখানে বারবার যাওয়া শক্ত; বিশেষ করে গরিব ঘরের মেয়েদের পক্ষে। তাঁদের তো গেরস্থালির কাজের সঙ্গে পয়সা রোজগারের কাজও করতে হয়। তার পরেও দেখা যায়, কাছাকাছি ক্লিনিক হয়তো রয়েছে, কিন্তু সেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসাকর্মী ও ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল পুষ্টির অবস্থা—সে জন্য যে সব দেশে শিশুমৃত্যুর হার বেশি, মানে পুষ্টির সামগ্রিক অবস্থা খারাপ, সে সব দেশে মাতৃমৃত্যুর হারও বেশি।

বিশ্বের অবস্থা

অধুনাতম তথ্য অনুসারে, ইটালিতে মাতৃমৃত্যুর হার সবচেয়ে কম, এক লক্ষ জীবিত শিশুজন্ম-পিছু ৩.৯। ব্রিটেনে এই সংখ্যা ৮.২, আমেরিকায় ১৬.৭। আমাদের প্রতিবেশি শ্রীলঙ্কায় মাতৃমৃত্যুর হার বেশ কম, ২৯.৮; এই দিক থেকে পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে শ্রীলঙ্কার স্থান ৬০ নম্বরে। আর ভারতের অবস্থান ১২৭ নম্বরে। 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' (মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোলস বা MDG) রিপোর্ট ২০১২-তে দেখা যাচ্ছে, সারা বিশ্বে ২০১০ সালে মোট দু'লক্ষ সাতাশি হাজার মাতৃমৃত্যু ঘটেছে। এটা ১৯৯০-এর চেয়ে ৪৭ শতাংশ কম। 'বিশ্বের মায়েদের অবস্থা'-র (State of the World's Mothers) বাৎসরিক রিপোর্ট বলছে, প্রতি বছর ভারতে ছাপ্পান্ন হাজার মাতৃমৃত্যু ঘটে। ভারতে উন্নয়ন যে ভাবে ঘটেছে, তাতে চোখ-ধাঁধানো অর্থনৈতিক উন্নতির ফল মোটেও সবার কাছে পৌঁছয়নি, ফলে ধনী আর দরিদ্রের বেঁচে থাকার মানে ফারাক বেড়েছে।

বিশ্বের সমস্ত মাতৃমৃত্যুর মধ্যে শতকরা ৫৬ ভাগই ঘটে সাহারা-নিম্ন

মায়ের পুষ্টি ঠিকঠাক না হলে আর তিনি প্রসবের সময়ে যথাযথ চিকিৎসাব্যবস্থার সুযোগ না পেলে মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে। দক্ষ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসাকর্মীর নাগাল পাওয়াটা একটা বড় ব্যাপার। চিকিৎসাস্থলটি যদি অনেক দূরে হয়, সবাই তার সুযোগ নিতে পারে না।

আফ্রিকায়, আর দক্ষিণ এশিয়ায় ঘটে শতকরা ২৯ ভাগ; এই দুই অঞ্চল মিলিয়ে বিশ্বের শতকরা ৮৫ ভাগ মাতৃমৃত্যু। এটা ২০১০ সালের হিসেব।

ভারতের অবস্থা

ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল-এর ত্রিবার্ষিক ভারতীয় স্যাম্পল সমীক্ষা ব্যবস্থার রিপোর্ট (Report of Registrar General of India Sample Registration System — RRGI-SRS) অনুযায়ী, মাতৃমৃত্যুর অধুনাতম তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যেটা, সেটা ২০০৭-২০০৯ সালের। এই সময় পর্বে ভারতে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল এক লক্ষ জীবিত শিশুজন্ম-পিছু ২১২। আবার 'বহু-সাংগঠনিক (WHO- UNICEF, UNFPA, World Bank) মাতৃমৃত্যু অনুমান' এর শেষতম রিপোর্ট ''মাতৃমৃত্যু হারের প্রবণতাঃ ১৯৯০ থেকে ২০১০'' অনুসারে ভারত ১৮১-টি দেশের মধ্যে ১২৭-তম, অর্থাৎ মাতৃমৃত্যুর হার অন্য অনেক দেশের তুলনায় এ দেশে বেশিই বলতে হবে। তাই যখন আমি শুনি, 'নমিনাল জিডি পি'-র হিসেবে ভারত হল অর্থনৈতিক ভাবে বিশ্বের নবম বৃহৎ দেশ, কিংবা জি-২০ বৃহৎ-ইকোনমি দলের অন্যতম সদস্যদেশ, তখন মনে হয় অর্ধসত্যই কেবল প্রচার করা হচ্ছে।

ভারতের মাতৃমৃত্যু হারের অবস্থা ঠিকঠাক বোঝার জন্য, এবং কী কী পরিবর্তন ঘটে গেছে সেটার একটা মানচিত্র তৈরি করার জন্য, ভারতের

১৯৯০ সাল থেকে ২০১৫ সাল—এই সময়কালের মধ্যে মাতৃমৃত্যু-হার কমিয়ে এক-চতুর্থাংশে নামিয়ে আনা ছিল পাঁচ নম্বর লক্ষ্যের প্রথম কর্মসূচি। ২০১০ সালে প্রতি ছ'মিনিটে একজন মা মারা যেতেন, ২০১২ সালের মধ্যে সেটা অনেকটা কমে গেছে, প্রতি দশমিনিটে একজন মা মারা যান।

রাজ্যগুলোকে তিনটি স্তরে ভাগ করে দেখা হয়—'ইএজি' রাজ্যসমূহ, 'দক্ষিণী' রাজ্যসমূহ, ও 'অন্যান্য' রাজ্যসমূহ। 'ইএজি' বা 'এমপাওয়ারড অ্যাকশন গ্রুপ' রাজ্য সমূহের তালিকায় আছে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, অসম, রাজস্থান, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগঢ় এবং উত্তরাখণ্ড। 'দক্ষিণী' রাজ্যসমূহের তালিকায় রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরল ও তামিলনাড়ু। বাকি সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সমেত) হল 'অন্যান্য' রাজ্যসমূহের তালিকায়। ভারতে রেজিস্ট্রার জেনারেল ২০১১ সালে জুন মাসে যে তথ্য প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখছি ২০০৪-২০০৬ সালে মাতৃমৃত্যু হার ছিল ২৫৪, আর ২০০৭-২০০৯ সালে সেটা দাঁড়িয়েছে ২১২। এই সময়ে 'ইএজি' বা 'এমপাওয়ারড অ্যাকশন গ্রুপ' রাজ্যসমূহে মাতৃমৃত্যু সবচেয়ে বেশি কমেছে, ৩৭৫ থেকে নেমে ৩০৮। 'দক্ষিণী' রাজ্যসমূহে মাতৃমৃত্যু হার ১৪৯ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১২৭, 'অন্যান্য' রাজ্যসমূহে হার ১৭৪ থেকে ১৪৯-এ নেমেছে।

যে সব রাজ্যে মাতৃমৃত্যুর হার এখনও ৩০০-র চেয়ে বেশি সেই রাজ্যগুলো হল অসম (৩৯০), উত্তরপ্রদেশ / উত্তরাখণ্ড (৩৫৯) ও রাজস্থান (৩১৮)। অন্যান্য 'ইএজি' রাজ্যসমূহে মাতৃমৃত্যুর হার ২৫০-র চাইতে এখনও বেশি। 'দক্ষিণী' রাজ্য চারটিকে যদি একসঙ্গে ধরি তা সেখানে মাতৃমৃত্যুর হার ১২৭; এর মধ্যে কর্ণাটকে হার সবচেয়ে বেশি (১৭৮) আর কেরলে সবচেয়ে কম (৮১)। 'অন্যান্য' রাজ্যসমূহের সবগুলো একসঙ্গে ধরলে মাতৃমৃত্যুর সম্মিলিত হার ১৪৯; তার মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের হার হল—গুজরাত ১৪৮, হরিয়ানা ১৫৩, মহারাষ্ট্র ১০৪, পাঞ্জাব ১৭২, আর পশ্চিমবঙ্গ ১৪৫।

রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিবের MDG নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। এ বার এটা নিয়ে একটু জেনে নেওয়া যাক। MDG হলো আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত আটটি বিষয়ে উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা। ২০০০ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সহস্রাব্দ সম্মিলনে 'রাষ্ট্রপুঞ্জের সহস্রাব্দ ঘোষণা' এই লক্ষ্যমাত্রাগুলো ধার্য করেছিল। রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য ১৮৯-টি দেশের প্রতিটি এবং অন্তত ২৩-টি আন্তর্জাতিক সংগঠন ২০১৫ সালের মধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। লক্ষ্যমাত্রাগুলো হল :

১। ভয়াবহতম দারিদ্র আর ক্ষুধা দূর করা।
২। সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা।
৩। লিঙ্গভিত্তিক অসাম্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন
৪। শিশুমৃত্যুর হার কমানো
৫। মায়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি
৬। এইচ আই ভি / এইডস, ম্যালেরিয়া, এবং অন্যান্য রোগের প্রতিবিধান করা
৭। পরিবেশের স্থায়িত্ব বজায় রাখা
৮। উন্নয়নের জন্য এক বিশ্বব্যাপী যৌথ উদ্যোগ গড়া।

১৯৯০ সাল থেকে ২০১৫ সাল—এই সময়কালের মধ্যে মাতৃমৃত্যু-হার কমিয়ে এক-চতুর্থাংশে নামিয়ে আনা ছিল পাঁচ নম্বর লক্ষ্যের প্রথম কর্মসূচি। ২০১০ সালে প্রতি ছ'মিনিটে একজন মা মারা যেতেন, ২০১২ সালের মধ্যে সেটা অনেকটা কমে গেছে, প্রতি দশমিনিটে একজন মা মারা যান। ২০০৭-২০০৯ সালে ভারতে মাতৃমৃত্যু-হার এক লক্ষ জীবিত শিশুজন্ম-পিছু ২১২, আর ২০১৫ সালের মধ্যে সেটাকে নামিয়ে ১০৯ করতে হবে। শক্ত কাজ। মনে হয়, ভারত মাতৃমৃত্যু-হার কমিয়ে আনার 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' পূরণে ব্যর্থ হবে। ১৯৯৯ সালের ৪৩৭ থেকে ২০০৭-২০০৯ সালে ২১২, এটা মাতৃমৃত্যু-হারের বড় উন্নতি। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে আরও দ্রুত কাজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে ভারত জনসংখ্যায় পৃথিবীতে দ্বিতীয়, কিন্তু মাতৃমৃত্যুর মোট সংখ্যায় বিশ্বে প্রথম।

মাতৃমৃত্যু-হার কমাতে ভারত যে সব ব্যবস্থা নিয়েছে :

২০০৫ সালে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (National Rural Health Mission বা NRHM) প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত সরকার একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা নিয়েছেন। মাতৃমৃত্যু-হার কমানো তার অন্যতম লক্ষ্য। এই প্রকল্পে যে সব মূল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলো হল :

- জননী-সুরক্ষা যোজনা-র মাধ্যমে সরকারি স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানে প্রসব করানো। এই যোজনায় মাকে প্রসবের পরে সরাসরি অর্থসাহায্য দিয়ে উৎসাহ দেওয়া হয়।
- উপ-প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে কার্যকর করে তোলা। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ও জেলা হাসপাতালে প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টা ন্যূনতম সামগ্রিক গর্ভকালীন ও প্রসব সংক্রান্ত ব্যবস্থা ও শিশুর যত্ন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা।
- 'আশা' (Accredited Social Health Activists–ASHA) এর মাধ্যমে ৮.৭১ লক্ষ 'সহযোগিনী' নিয়োগ করা, যাতে সমস্ত কমিউনিটির ভেতর থেকেই স্বাস্থ্য-পরিষেবা নিয়ে একটা চাহিদা তৈরি হয়, এবং

সেই স্বাস্থ্য-পরিষেবা নাগালের মধ্যে আসে। 'আশা' সহযোগিনীরা সমস্ত মা'কে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেন, যাতে তাঁরা গর্ভাবস্থায় অন্ততপক্ষে তিন বার স্বাস্থ্যপরীক্ষা করান এবং সরকারি স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানে প্রসব করানোর চেষ্টা করেন; তারপর সহযোগিরা মায়েদের স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানে আনায় সাহায্য করে থাকেন।

- ২০১১ সালে শুরু হওয়া 'জননী-শিশু-সুরক্ষা কার্যক্রমের' উদ্দেশ্য হল যে কোনও মা'কে যেন সরকারি স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানে প্রসব করাতে বা এক মাস বয়স অবধি শিশুদের চিকিৎসার প্রয়োজনে নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ না করতে হয়।

জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (NRHM) প্রকল্পের পুরো টাকাটা দেন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং সেটা সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রূপায়িত হয়। যে সব রাজ্যে ভাল কাজ হয়নি আর মাতৃমৃত্যুর-হার বেশি (যেমন 'ইএজি' বা 'এমপাওয়ারড অ্যাকশন গ্রুপ' রাজ্যসমূহে), সেখানে এই কার্যক্রমে বেশি জোর দেওয়া হয়।

ভারতে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা :

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে রেজিস্ট্রার জেনারেল জনগণনা ও জন্মমৃত্যুর রেজিস্ট্রি দেখাশোনা করার সঙ্গে সঙ্গে 'নমুনা রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা' (Sample Registration System বা SRS)-র সাহায্যে বিভিন্ন কারণে মৃত্যুর একটা মোটামুটি হিসেব দিয়ে থাকেন। মাতৃমৃত্যুর আন্দাজ দেবার জন্য SRS-ই এই দেশে সর্ববৃহৎ জনভিত্তিক নমুনা সমীক্ষা, যা থেকে অন্য নানা বিষয়েরও আন্দাজ পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থার দু'টো ন্যায্য সমালোচনা আছে। এক, মৃত্যুর সব রিপোর্ট পাওয়া যায় না। দুই, মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ে ত্রুটি। এই দু'টি বিষয়ের কোনটি নিয়ে গভীর আলোচনার পরিসর এখানে নেই। তবে মহানগরীতে একজন তরুণী যখন 'এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি' বা ভুল জায়গায় গর্ভসঞ্চারের ফলে মারা যান আর তাঁর 'ডেথ সার্টিফিকেটে' লেখা হয় 'হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে মৃত্যু', তখন ব্যবস্থাটির ওপর আমাদের আস্থা বাড়ে না।

আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় অনেক সমস্যাই রয়েছে, কিন্তু সব থেকে বড় সমস্যা বোধহয় এই যে আমরা নিজেদের ভুলগুলো জানার কোনও ব্যবস্থা রাখিনি। ফলে ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া আমাদের কাছে নেহাতই কথার কথা। মাতৃমৃত্যুর কারণ ঠিক ভাবে জানার সমস্যাটি সেই বৃহৎ সমস্যার এক লক্ষণ। 'মৃত্যুর কারণ' নিয়ে ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা কথাটা আমাদের মেনে নিতে হয়, অথচ আমরা এখনি দেখলাম, সেই সার্টিফিকেটে সব সময়ে সঠিক কারণ পাওয়া যায় না। না-পাওয়াটা অবশ্য অহেতুক নয়। বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারি স্তরে সঠিক তথ্য জানার চেষ্টা করলে তা পাওয়া যাবে না, কেননা প্রত্যেকেই নিজের পিঠ-বাঁচানোর চেষ্টা করবেন। ফলে ডেথ সার্টিফিকেটে সত্যি কারণ সবসময় লেখা হবে না। কিন্তু এটা বদলানো যায়। যেমন ব্রিটেনে বিগত ষাট বছর ধরে মাতৃমৃত্যুর কারণ জানার একটা ব্যবস্থা আছে। তাতে মৃতার ও চিকিৎসক বা চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের পরিচয় গোপন থাকে, ফলে সেটা নিয়ে আদালতে কেস করা যায় না। এই ব্যবস্থার নাম ''Confidential Enquiries into Maternal Deaths'', এর প্রথম রিপোর্টটি ছিল ১৯৫২-১৯৫৪ কালপর্বে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এর মাতৃমৃত্যু নিয়ে। তার পর থেকে ও দেশে এই রকম রিপোর্ট নিয়মিত ভাবে তৈরি হচ্ছে। এতে প্রত্যেক চিকিৎসক বা চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান মৃত্যুর কারণটি সৎভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই ভাবে একটি নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান তৈরি হয়। তার ওপর ভিত্তি করে ঠিক করা যায় কোথায় সমস্যা, আর কী করলে সেই সমস্যার সমাধানে এগোনো যাবে। কিন্তু আমাদের 'সিস্টেম' সমস্যাকে শুধু ধামাচাপাই দিতে জানে।

প্রতিরোধ : অধিকাংশ মাতৃমৃত্যু প্রতিরোধ-যোগ্য। চিকিৎসা ব্যবস্থার অধীনে রোগিনী এসে গেলে গর্ভকালীন ও প্রসব-সংক্রান্ত প্রায় যাবতীয় সমস্যা প্রতিরোধ বা প্রতিকার করা সম্ভব। দরকার হলো মা যাতে স্বাস্থ্য-পরিষেবা ব্যবস্থার সুযোগ পান সেটা দেখা। গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের সময়ে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকের তত্ত্বাবধান, আর প্রসবের পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে সঠিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী দিয়ে দেখভাল অবশ্য কর্তব্য। মনে রাখতে হবে প্রসবের পরের মাতৃমৃত্যুর বড় অংশ (৪৫%) ঘটে প্রথম চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে।

শেষ কথা : স্বাধীনতার পরে ৬৬ বছর কেটে গেল। গত দশকে চমকে দেওয়ার মতো অর্থনৈতিক বিকাশও হল। তবু আমরা পৃথিবীর অপুষ্টির রাজধানীর শিরোপা মাথা থেকে নামাতে পারলাম না। এ দেশের শিশুদের শতকরা ৪৮ ভাগ নিম্ন পুষ্টির শিকার, আর এটা আমাদের বিশ্বজোড়া 'খ্যাতি'র কারণ! আমাদের শিশু আর তাদের মায়েদের মৃত্যুর মিছিল আমাদের জাতীয় লজ্জা।

মাতৃমৃত্যু মানে এঁরা কোনও রোগে মরছেন না, কোনও মহামারী হয়নি। দারিদ্র, অপুষ্টি আর ন্যূনতম স্বাস্থ্য-পরিষেবার অভাবে এঁদের মৃত্যু হচ্ছে। আমরা হাজারটা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য-পরিষেবা দিল্লির সেই গৃহহীন পথবাসী মায়ের মতো সমাজের আর্থিক পিরামিডের একদম নিচুতলার সেবায় নিয়োজিত হচ্ছে কি? যত দিন তা না হচ্ছে তত দিন আমাদের দেশে লক্ষকোটি মায়ের কাছে 'নিরাপদ মাতৃত্ব' কথাটি এক অর্থহীন বাগবিস্তার, এক সুদূর মরীচিকা।

লেখক পরিচিতি : ডা. কাঞ্চন মুখার্জি, এমবিবিএস, এমআরসিওজি, স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

ডাক্তারের ডেস্ক

মেলাজমা ও সানস্ক্রিন

পত্রিকার সম্পাদকের দপ্তরে নানারকম চিঠি আসে। সব চিঠি ছাপা হয় না, সব চিঠির উত্তরও দেওয়া হয় না— দিতে পারলেই ভাল ছিল যদিও। অনেক ক্ষেত্রেই চিঠিতে বিশেষ প্রশ্ন থাকে, আমাদের পরবর্তী কোনও লেখায় তার জবাবটা দেওয়া হয়ে যায়। কয়েকটা চিঠি পড়ে ছিল অনেক দিন ধরেই। সে সব জমা চিঠি, পোস্টে আসা ও ই-মেল আসা চিঠি, হাতে হাতে পাঠানো চিঠি নিয়ে বসেছিলাম। উত্তর দিতে বসে আমার মনে একটা পুরনো, বহু দিন জানা কথাই বার বার আঘাত করতে লাগল। ত্বকের সমস্যা নিয়ে চিঠি। সমস্যাগুলো নতুন কিছু নয়, রোজকার দেখা সমস্যা। কিন্তু পত্রলেখকদের মধ্যে কোনও পুরুষ নেই, সব, সবই মহিলাদের লেখা চিঠি। মনে মনে ফিরে গেলাম আমার চেম্বারে, হাসপাতালে। সেখানে এই সমস্যা নিয়ে কিছু পুরুষ আসেন বটে, কিন্তু মহিলাদের মতো অত মরিয়া, অত আতঙ্কগ্রস্ত মনে হয় না তাঁদের।

তারই কয়েকটি চিঠি এখানে তুলে দিই, আর চিকিৎসার কথাটুকু বলার পাশাপাশি বোঝার চেষ্টা করি ঠিক কীভাবে এগুলো মেয়েদের কাছেই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন : আমার গালে বহু দিন ধরে কালো একটা দাগ আছে। বাচ্চা পেটে আসার সময়ে হয়েছিল বছর দশেক আগে। ডাক্তারবাবু দেখে বললেন মেচেতা। ওষুধে কমে, কিন্তু সারে না। কী লাগাব?—নবনীতা পয়রা, নলপুর, হাওড়া। (আরও তিনটে এরকম চিঠি আছে)।

উত্তর : মেচেতা জিনিসটা নিয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। তা না হলে বোঝা যাবে না আপনার সত্যিই মেচেতা হয়েছে কি না, আর কীভাবে সেটার চিকিৎসা করা যায়।

চিকিৎসকেরা মেচেতাকে যে পরিভাষায় ডাকেন তা হল 'মেলাজমা' (Melasma)। গর্ভাবস্থায় মা-র 'মেলাজমা'-কে আগে 'ক্লোয়াজমা' বলা হত, কিন্তু আলাদা করে নাম রাখার কোনও যুক্তি নেই বলে এখন সেই 'ক্লোয়াজমা' শব্দটা উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মেলাজমা আমরা আকচারই দেখছি, বহু মানুষের এ রোগ হয়। গালে সবচেয়ে বেশি হয়, তা ছাড়া নাকে, ওপরের ঠোঁটে, চিবুকে, কপালে মেলাজমা হয়। এমনকী মুখের বাইরে ত্বকের অন্যান্য খোলা জায়গায় এই রোগ হতে পারে, তবে সম্ভাবনা কম। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মেলাজমা হবার সম্ভাবনা বেশি। সাদা চামড়ার মানুষদের তুলনায় আমাদের দেশের মানুষের মেলাজমা বেশি হয়। সত্যি কথা বলতে কী, ত্বকের রং সংক্রান্ত যত সমস্যা, এদেশে মেলাজমা তার মধ্যে এক নম্বর। তবু সুখের কথা, শ্বেতি নিয়ে যেমন অকারণ আতঙ্ক আছে, মেলাজমা নিয়ে তা নেই।

মেলাজমা সাধারণত মুখের দু'দিকে মোটামুটি সমভাবে হয়। মোটের ওপর গোলাকার, বা তেকোনা ছোপ, তার ধারগুলো অস্পষ্ট ও এবড়ো-খেবড়ো। রং হালকা বাদামি থেকে ঘন বাদামি-কালো হতে পারে। মেয়েদের এ রোগ বেশি হয়। ডাক্তারবাবুরা বিশেষ আলো (Wood's lamp) দিয়ে দেখে অনেক সময় বলেন, এটা এপিডারমাল, এটা ডারমাল, এটা মিক্সড মেলাজমা। সমস্যা হল, আমাদের দেশে ফরসা মানুষদের ছাড়া

চিকিৎসার আগে

চিকিৎসার পরে

আর কারও মেলাজমা কোন ধরনের সেটা এই ভাবে বলা যায় না। এই কালো লোকেদের মেলাজমা-কে ডাক্তাররা বলেন 'ইনডেটারমিনেট' মেলাজমা—সোজা কথায়, কেমন ধরন সেটা বলা যাচ্ছে না। কেমন ধরনের মেলাজমা—সেটা ধরতে পারলে খুব ভাল হয়, চিকিৎসায় ফল কেমন হবে, অনেকটা আঁচ করা যায়।

অবশ্য আরও এক ভাবে মেলাজমা-কে দু'দলে ভাগ করা যায়। দীর্ঘস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী। ধরুন গর্ভাবস্থায় কারও মেলাজমা হল, বাচ্চা হওয়ার এক বছর পরে চলে গেল—এটা ক্ষণস্থায়ী ধরন। এঁদের কিন্তু বাচ্চা বন্ধের বড়ি খেলে মেলাজমা ফিরে আসতে পারে। আবার কেউ খুব রোদে ঘুরল চার মাস, মেলাজমা হল। তারপর বাড়ি বসে থাকল—ন'মাসে মেলাজমা উধাও। নবনীতা পয়রা, আপনার এই রকম মেলাজমা হলেই ভাল হত, কিন্তু দশ বছর ধরে যে মেলাজমা আছে সেটা এই রকম নয়, দীর্ঘস্থায়ী ধরনের, সেটা তো বুঝতেই পারছেন।

গর্ভাবস্থায় বা বাচ্চা বন্ধের বড়ি খেলে মেলাজমা হয়, রোদে ঘুরলেও হয়। কিছু ক্ষেত্রে নানা কসমেটিক থেকেও হতে পারে, ওভারি ও থাইরয়েডের রোগে হতে পারে। সুতরাং রোদে পারতপক্ষে যাবেন না। সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে পারেন, তবে মনে রাখবেন সানস্ক্রিন একবার মাখার পর মোটামুটি ঘন্টা-দুয়েকের বেশি পুরো সুরক্ষা দেয় না। সাবান ও অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্যের ব্যাপারে সতর্ক হন; কোনও প্রসাধন দ্রব্য আপনার মেলাজমার জন্য দায়ী হলেও হতে পারে সেটা জানার কোনও সহজ উপায় নেই, চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখুন। প্রসাধনে থাকা গন্ধদ্রব্য বা বীজাণুনাশক— এই দু'টি জিনিস সমস্যার মূল হতে পারে। যে সানস্ক্রিন আপনি মাখছেন মেলাজমার হাত থেকে বাঁচতে, সেই সানস্ক্রিনের থেকেও সমস্যা হতে পারে—সর্ষের মধ্যে ভূত আর কী! প্রসঙ্গত, বীজাণুনাশক মেশানো সাবান বা পাউডার—এসব আপনার রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে, এমন কোনও প্রমাণ নেই, সুতরাং বাদ দিতে পারেন ওইসব। ইস্ট্রোজেন (মূলত মেয়েদের হরমোন) ওষুধ হিসেবে চলে অনেক রোগেই, সেরকম কিছু খেলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন, বন্ধ করা সম্ভব কি না জানুন। বাচ্চা

বন্ধের বড়ি খেলে তার বদলে অন্য ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করুন। এ ছাড়াও, আপনি কী কী ওষুধ খাচ্ছেন সেটা ডাক্তারবাবুকে জানান—অল্প কিছু ক্ষেত্রে অন্য ওষুধেও মেলাজমা হতে পারে, বা সেই ওষুধটি মেলাজমা সারার পথে বাধা হতে পারে। তাতেও কাজ না হলে আপনার ওভারি বা থাইরয়েডের রোগ আছে কি না দেখে নেওয়া জরুরি।

এ বার আসি ওষুধ প্রসঙ্গে। মূল চিকিৎসা হল মলম। প্রথমেই বলি, কী করবেন না। নানা ওষুধ কোম্পানি নানা কিসিমের ভিটামিন ইত্যাদি নানা জিনিসের বড়ি দামি প্যাকেজিং-এ চড়া দামে বেচছেন—সেগুলো নাকি সূর্যরশ্মিজনিত ক্ষতি থেকে আপনাকে রক্ষা করে। কিছু পরীক্ষায় দেখা গেছে এগুলো সূর্যরশ্মিজনিত ত্বকের নানা ক্ষতি খানিক আটকাতে পারে। কিন্তু মেলাজমায় এ সবের কার্যকারিতার জোরদার প্রমাণ এখনও নেই। সুতরাং আপনার মানিব্যাগের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে এ সবে হাত না দেওয়াই ঠিক। আর নানা কসমেটিক কোম্পানি বহু 'দাগভ্যানিশ', 'নেইস্পট' প্রায় এই ধরনের লোভনীয় নামের দামি দামি ক্রিম লোশন এনেছে। সেগুলোতে যে কী আছে, সেটা 'ট্রেড-সিক্রেট' বলে কাউকে জানতে দেয় না, অথবা খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যায় প্রমাণিত-অপ্রমাণিত নানা ওষুধের হাঁসজারু কম্বিনেশন---মাখলে বিলক্ষণ লাভ গ্যারান্টেড। তবে লাভটা প্রসাধন-কোম্পানির, আপনার লাভ হবে, তেমন প্রমাণ নেই। সেরকম প্রমাণ দেওয়ার দায় থেকেও এদেশে প্রসাধন- কোম্পানিগুলো মুক্ত—যা-ইচ্ছে-তাই দাবি করলেও আইনে কিছু করার নেই, এক যদি না কারও বিশাল ক্ষতি কিছু হয়ে যায়।

এ ছাড়া আছে নানা রকমের চিকিৎসা-পদ্ধতি, যেমন পিলিং। এখানে অ্যাসিড জাতীয় জিনিস দিয়ে ত্বকের উপরিভাগে সুনিয়ন্ত্রিত আঘাত করা হয়, ত্বকের ওপরের স্তরটি উঠে যায়। এ ছাড়া লেসার রশ্মি দিয়েও চিকিৎসা হয়। যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতে এগুলো ক্ষতিকর নয়, এবং ঠিকঠাক রোগীর জন্য খুব ভাল চিকিৎসা। কিন্তু দু'টো সমস্যা আছে—খরচ বেশি, আর খরচ বেশি বলেই কতিপয় চিকিৎসক ও 'বিউটি পার্লার' এই পদ্ধতি স্থানে-অস্থানে চালাতে চাইছেন। ফলে অতিচিকিৎসা হচ্ছে, রোগীর খামোকা খরচ হচ্ছে, এবং প্রশিক্ষণহীন অবিশেষজ্ঞ পয়সার লোভে বিশেষজ্ঞ সেজে এই সব চিকিৎসা করছে। মনে রাখবেন, এই রকম চিকিৎসা কেবলমাত্র তখনই দরকার, যখন মলম দিয়ে বহু দিন চিকিৎসা করেও কাজ হয়নি। যথার্থ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক ছাড়া এ সব করালে বিপদে পড়তে পারেন।

এই বার আসল চিকিৎসার কথায় আসি। বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার মধ্যে এক নম্বর হল হাইড্রোকুইনোন বলে এক রকম ওষুধ, যার ২% থেকে ৫% মলম দিনে একবার লাগাতে হয়। পাঁচ থেকে সাত সপ্তাহ লাগলে এই ওষুধে কাজ পাওয়া যায়, সুতরাং এক হপ্তাতেই যে সব রোগী ''ধ্যুত কিসস্যু হচ্ছে না'' বলে ছেড়ে দেন, তাঁরা ভুল করবেন। অন্তত তিন মাস চিকিৎসা চালানো দরকার, একটানা এক বছরও এই মলম লাগানো দরকার হতে পারে। দু'টো কথা মনে রাখবেন—এক, ডারমাল বা মিক্সড মেলাজমার তুলনায় এপিডারমাল মেলাজমা সহজে চলে যায়। দুই, মলম দিয়ে চিকিৎসা স্রেফ সাময়িক উপশম দেয়। কিন্তু যদি মেলাজমার হওয়ার কারণগুলো জানা না থাকে, বা সেই কারণগুলো দূর করার পরেও আপনার মেলাজমা না যায়, তা হলে মলম দিয়ে সাময়িক উপশমই একমাত্র উপায়। তবে দেখতে হবে তাতে ত্বকের ক্ষতি যেন না হয়। ক্ষতির মধ্যে জ্বালা করা, লাল হয়ে যাওয়া এ সব হলে আপনি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝবেন পার্শ্বক্রিয়া হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে আপনাকে হাইড্রোকুইনোন বন্ধ করতে হবে। কিন্তু অনেক দিন ব্যবহার করতে করতে সাদা সাদা ছোপ এসে যাওয়া, মুখে খুব ছোট ছোট গুটি বেরোনো, বা আরও গভীর কালচে দাগ হয়ে যাওয়া—এই সব সমস্যা হতে সময় লাগে, আপনার পক্ষে ধরাও কঠিন হতে পারে। সুতরাং হাইড্রোকুইনোন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধান ছাড়া ব্যবহার করতে নেই।

হাইড্রোকুইনোন ছাড়া অ্যাজলেয়িক অ্যাসিড, কোজিক অ্যাসিড, আরবিউটিন, গ্লাইকোলিক অ্যাসিড, মেকুইনল, অ্যাসকরবিক অ্যাসিড, নিয়াসিনামাইড, লিকোরাইস, ফ্লাভিনয়েড গোত্রের নানা রাসায়নিক—এসবই মেলাজমার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। তবে এদের অনেকগুলোর ক্ষেত্রে চিকিৎসাশাস্ত্রীয় প্রমাণ এখনও একটু কাঁচা। লাগানোর স্টেরয়েড, ভিটামিন এ ইত্যাদি—এরা অবশ্য বেশ প্রমাণিত ওষুধ, কিন্তু এদের কোনওটাই হাইড্রোকুইনোন-এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী নয়। তাই সাধারণভাবে প্রথমে ডাক্তাররা হাইড্রোকুইনোন মলম লেখেন, তাতে পার্শ্বক্রিয়া হলে বা কাজ না হলে অন্য ওষুধ দেওয়া হয়। এর ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু সে সব নিয়ে আলোচনার পরিসর এখানে নেই। অনেক রকম ওষুধ মিশিয়ে কম্বিনেশন থেরাপিও চলে, সে সব কম্বিনেশনের অধিকাংশই তেমন পরীক্ষিত নয়। তবে মেলাজমার দাগ তোলার জন্য হাইড্রোকুইনোন বা ওই রকম কোনও ওষুধ রাতে লাগানো, তার সঙ্গে দিনের বেলায় সানস্ক্রিন মাখা---এই 'কম্বিনেশন' প্রমাণিত চিকিৎসা। আবার, হাইড্রোকুইনোন-এর সঙ্গে বিশেষ মাত্রায় লাগানোর স্টেরয়েড, ভিটামিন-এ মিশিয়ে তৈরি 'কম্বিনেশন-মলম'-ও (Kligman formula) চিকিৎসাবিজ্ঞান-সম্মত। আবার বলি, এ সব যা-ই মাখুন না কেন, সেটা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া করবেন না।

আজকাল অনেক চিকিৎসকই প্রথমে এই ক্লিগম্যান ফর্মুলার 'কম্বিনেশন-মলম' দিয়ে মেলাজমার দাগটি একটু তাড়াতাড়ি কমিয়ে নেন। তারপর একটি মাত্র ওষুধ, সাধারণত হাইড্রোকুইনোন, দিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে যান। কিন্তু যত বেশি ওষুধ, তত পার্শ্বক্রিয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং ডাক্তারের তত্ত্বাবধান ছাড়া এ রকম চিকিৎসা নৈব নৈব চ। প্রায়ই এমন মেলাজমার রোগী আমাদের কাছে আসেন, অধিকাংশই মহিলা, তাঁদের মুখ লাল, জ্বালা করছে, রোদে গেলে অসহ্য লাগছে, সাদা-কালো ছোপ মুখ ভর্তি, এমনকী মেয়েদের গালে দাড়িও গজিয়ে গেছে। এঁরা 'কিছু ওষুধ' এদিক-সেদিক থেকে লাগিয়েছেন, তারপর পার্শ্বক্রিয়ার ঠেলায় ডাক্তারের কাছে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এই 'কিছু ওষুধ'-গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্টেরয়েড-ঘটিত মেলাজমার কম্বিনেশন থেরাপি, বা হাটে বাজারে 'সর্বরোগহর কান্তিপ্রদ গ্ল্যামারবর্ধক ক্রিম' হিসেবে বিক্রি হওয়া স্টেরয়েড মলম। নবনীতা দেবী, আপনার ত্বকের স্বার্থে এই রকম ক্ষতিকর হাতুড়ে-চিকিৎসা থেকে শতহস্ত দূরে থাকবেন।

প্রশ্ন : আমার বন্ধুরা সব সানস্ক্রিন মেখে ফর্সা হয়েছে। ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করে আমিও একটা সানস্ক্রিন লিখিয়েছিলাম। কিন্তু মাখলে বড্ড ঘাম হচ্ছে। ব্যবহার করতে পারছি না। আমার এক বন্ধুর সানস্ক্রিন মেখে দেখেছি, আমার অসুবিধা হয় না। কিন্তু ডাক্তারবাবু দেখিয়ে দিলেন, সেটার SPF অনেক কম। কী করি? আর SPF ব্যাপারটা কী, জানাবেন?—শ্রীমন্তী দত্ত, কাটোয়া, বর্ধমান (আরও চারজন প্রায় এই রকম প্রশ্ন করেছেন)।

প্রশ্ন : আমার মেচেতার জন্য ডাক্তারবাবু সানস্ক্রিন মাখতে বলেছেন।

বড্ড দাম, ছাতা মাথায় দিয়ে চালানো যায় না?—অনামিকা দে, শ্রীরামপুর, হুগলী।

উত্তর : বছর বিশেক আগেও সানস্ক্রিন জিনিসটার তেমন চল ছিল না, এখন সবাই পারলেই সানস্ক্রিন মাখেন। কেন মাখেন, সেটা একটু ছোট্ট করে ঝালিয়ে নিই, তারপর কার কোন সানস্ক্রিন দরকার, বা ছাতা দিয়েই চালিয়ে দেওয়া যায় কি না, সেই আলোচনা বুঝতে সুবিধে হবে। শ্রীমন্তী দত্ত, আপনার ব্যবহার করা সানস্ক্রিনগুলো দেখলে বা তাদের নাম জানলেও তাও কিছু বলতে পারতাম, দুঃখের বিষয় হল, আপনি সে সব জানাননি। এই অবস্থায় শর্টকাট করে 'এইটা মাখুন' বলে দিতে পারব না। অনামিকা দে, আপনি এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত মেচেতা নিয়ে অন্য প্রশ্নের উত্তরটাও এই সঙ্গে পড়ে নিন।

সাদা চামড়ার মানুষেরা সানস্ক্রিন মাখেন মূলত চামড়ার ক্যানসার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। ওদের আবার ফ্যাটফেটে সাদা চামড়া পছন্দ নয়, খানিক ট্যান হওয়া, সাদার ওপরে বাদামি পোঁচ লাগা চামড়াই চাই। ফলে দেখবেন সমুদ্রসৈকতে সাহেব-মেমরা কেমন খালি গায়ে রোদ পোয়ান। খালি ত্বকে বেশি রোদ লাগলে সানবার্ন বা রোদে-পোড়া হয়, সেটা বেশ কষ্টদায়ক। এমনকী আমাদের মতো কালা আদমিদেরও সানবার্ন-এর অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে, আর সেটা মোটেই সুখের নয়। সেটা থেকে বাঁচতে এঁরা সানস্ক্রিন মাখতেন। কিন্তু প্রথম দিকে ভাল সানস্ক্রিন ছিল না, আর ডাক্তাররা বলতেন, রোদে গেলে বড় বনাতওয়ালা টুপি পরে, ফুলহাতা জামা পরে, ফুলপ্যান্ট পরে যাবেন।

সাহেব ডাক্তাররা দেখলেন, এঁদের ত্বক-ক্যান্সার হচ্ছে। সূর্যের কিরণের অনেকগুলো অংশ। আমরা যেটা চোখে দেখি সেটা তো দৃশ্যমান আলো। কিন্তু সূর্যালোকে রয়েছে ইনফ্রারেড রশ্মি, চোখে দেখা যায় না, কিন্তু সেটাই সূর্যের তাপের মূল অংশ। এ ছাড়াও রয়েছে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি, সেটাও চোখে দেখা যায় না, কিন্তু খুব শক্তি তার, জীবকোষে নানাবিধ ক্ষতি করতে পারে। ত্বকের কোষের উপর সরাসরি পড়ে সূর্যালোক, তার আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি তাই প্রথমেই ত্বককোষের ক্ষতি করে। ছোটখাটো নানা ক্ষতি হয়, যেমন রোদে পোড়া, কিন্তু বড় ক্ষতি ক্যানসারও হতে পারে। সুতরাং সাহেব ডাক্তাররা বললেন, সূর্যের আলোয় ঘোরাঘুরি নিষেধ। কিন্তু কে আর শুনছে নিষেধ? ফ্যাশন যখন ট্যান-করা চামড়ার, তখন গোলি মারো ডাক্তারের কথায়। এই পরিস্থিতিতে 'কম্প্রোমাইজ সল্যুশন' হল সানস্ক্রিন। রোদ লাগবে, তবে তার আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি ত্বকের মধ্যে একসঙ্গে অনেকটা ঢুকতে পারবে না। রোদ লেগে ত্বক বাদামি হয়ে আসবে, তবে আস্তে আস্তে। এই কথাটা সবার মনে ধরল, কেননা সানস্ক্রিন ছাড়া রোদে থাকলে একে রোদে পোড়া হওয়ার সম্ভাবনা, তার ওপর ডাক্তাররা বলছেন ক্যানসার হবে। এই সময়ে আর একটা ঘটনা ঘটল—দূষণের ফলে বায়ুমণ্ডলে ওজোনস্তরে ছিদ্র। আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরে অনেকটাই আটকে যায়, সেই স্তরেই ফুটো হওয়া মানে আরও বেশি আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি ত্বকে লাগা—ফল ক্যানসার। এ রকম একটা অবস্থায় সাদা চামড়ার লোকেরা প্রায় সব্বাই সানস্ক্রিন মাখতে শুরু করলেন, বিশেষ করে আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়ায়, কেননা ওখানে সাদা চামড়ার মানুষও বেশি, আবার ইংল্যান্ড-ফ্রান্স ইত্যাদির চাইতে সূর্যালোকও বেশি তীব্র। উদ্দেশ্য ত্বককে আস্তে আস্তে ট্যান করা, রোদে না পুড়িয়ে—একবার ট্যান হয়ে গেলে তো ত্বক-ক্যানসার রোখার জন্য সেই ট্যানটাই বেশ কাজে

লেগে যায়।

এইটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। ট্যান হওয়া মানে ত্বকে মেলানিন নামক কালো পদার্থটি বেড়ে যাওয়া। মেলানিন ত্বকের গভীরে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিকে ঢুকতে দেয় না, আটকে দেয়। সেই জন্যেই সাহেব-মেমদের ট্যান হলে ত্বক-ক্যানসার খানিকটা আটকায়। এদেশে বা আফ্রিকায় কালো চামড়ার মানুষদের গায়ে তীব্র রোদ লাগে, অথচ ত্বক-ক্যানসার তুলনায় অনেক কম—কালো রং-ই আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। ''কালো যদি মন্দ এমন, ত্বক-ক্যানসারে তারে ডাকো কেনে?''

কিন্তু আমেরিকার সর্দি লাগলে আমাদের যে হাঁচি হয়। আমরাও সানস্ক্রিন-এর বেজায় ভক্ত হয়ে উঠলাম, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ঠিক বিপরীত। আমরা কালো হওয়া আটকাতে, ফর্সা হতে সানস্ক্রিন-শরণাগত হলাম। শ্রীমন্তী দত্ত ঠিক এই উদ্দেশ্যেই ডাক্তারের কাছে সানস্ক্রিন চেয়েছিলেন। অনামিকা দে অবশ্য ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন মেচেতা বা মেলাজমা-র চিকিৎসার জন্য, তাঁকে ডাক্তারবাবু সানস্ক্রিন দিয়ে ঠিকই করেছেন, কেননা সূর্যালোকে মেচেতা বাড়ে। শ্রীমন্তী দত্ত ভুল করছেন এটা বলতে চাইছি না কিন্তু, খালি বলতে চাইছি তাঁর উদ্দেশ্যটা পুরোপুরি প্রসাধনিক, ফর্সা চামড়ার যে সামাজিক কদর আমাদের দেশে রয়েছে সেই মানসিকতাকে আত্মীকৃত করেছেন তিনি।

এ বার আসি SPF প্রসঙ্গে। SPF বা Sun Protective Factor, এস পি এফ। সুনির্দিষ্ট অবস্থায় কোনও সানস্ক্রিন মাখার ফলে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি (মূলত UVB) দ্বারা ত্বকে 'লাল হয়ে যাওয়া' কতটা আটকানো গেল, সেটা দিয়ে এসপিএফ মাপা হয়। কারও (সাহেব বা মেমের) ত্বকের ওপর আল্ট্রাভায়োলেট 'বি' রশ্মি ফেলা হল, দেখা গেল পাঁচ মিনিটে সেই ত্বক লাল হয়ে যাচ্ছে। তারপর পরীক্ষাধীন সানস্ক্রিনটি 'যথাযথভাবে' মাখানো হল, ওই একই মাত্রার আল্ট্রাভায়োলেট 'বি' রশ্মি ফেলা হল, দেখা গেল ত্বক আর পাঁচ মিনিটে লাল হচ্ছে না, সময় লাগছে ৭৫ মিনিট। অর্থাৎ ১৫ গুণ বেশি সময়ে ত্বক লাল হচ্ছে। তার মানে সানস্ক্রিনটি থাকার কারণে একই পরিমাণ আল্ট্রাভায়োলেট 'বি' রশ্মি সহজে ত্বকে ঢুকে ক্ষতি করতে পারছে না। ক্ষতি করার ক্ষমতা ১৫ ভাগের এক ভাগ মাত্র হয়ে যাচ্ছে। এই সানস্ক্রিনটির এসপিএফ হল ১৫। অন্য একটি সানস্ক্রিন হয়তো আরও শক্তিশালী, একই পরিমাণ আল্ট্রাভায়োলেট 'বি' রশ্মি ১৫০ মিনিট ধরে

লাগালে তবে সেটা লাল হচ্ছে। এই সানস্ক্রিনের এসপিএফ হল ৩০।

একটু অন্য ভাবে বিচার করি। যে সানস্ক্রিনের এসপিএফ হল ১৫, সেটি মোট আল্ট্রাভায়োলেট 'বি' রশ্মির শতকরা ৯৩ ভাগ আটকে দেয়। আর যে সানস্ক্রিনটির এসপিএফ ৩০, সেটি আটকায় শতকরা ৯৭ ভাগ আল্ট্রাভায়োলেট 'বি' রশ্মি। অঙ্কের কারিকুরিতে শতকরা মাত্র চারভাগ আল্ট্রাভায়োলেট 'বি' রশ্মি আটকানোর ফলে সানস্ক্রিনের এসপিএফ ১৫ থেকে বেড়ে ডাবল ৩০ হয়ে যাচ্ছে। কেউ যদি খুব ফর্সা হন, এবং তাঁকে অনেকটা সময় সূর্যের আলোয় কাজ করতে হয়, তবে হয়তো এসপিএফ ১৫ থেকে ৩০ হলে তাঁর ভাল হয়, নইলে এ দু'টোতে কাজে তেমন তফাৎ নেই। উপরন্তু, এসপিএফ বাড়লে সানস্ক্রিনের দাম বাড়ে, সাধারণত বেশি এসপিএফ সানস্ক্রিনে অসুবিধা বেশি হয়, কেন না তাতে ঘাম হওয়া, জ্বালা করা ইত্যাদির হার বেশি। আবার এমনও আছে যে সানস্ক্রিনে বেশি এসপিএফ লেখা আছে বটে, কিন্তু সেটা দ্রুত ঘাম হয়ে ধুয়ে যাচ্ছে, কমদামি, কম এসপিএফ লেখা সানস্ক্রিন বেশিক্ষণ থাকছে; ফলে কম এসপিএফ সানস্ক্রিনে, আসলে কিন্তু বেশি সুরক্ষা পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং শ্রীমন্তী দত্ত, কম এসপিএফ বলে অন্য সানস্ক্রিনটি খারাপ, সেটা ভাববেন না। ডাক্তারবাবুর লেখা বেশি এসপিএফ সানস্ক্রিনটি আপনি মুখে মেখে থাকতেই পারছেন না, সেটা তো আর আপনার ওষুধের বাক্সে থাকলে সুরক্ষা দেবে না।

কিন্তু শ্রীমন্তী দত্তর মতো যাঁরা ফর্সা হওয়ার আশায় সানস্ক্রিন মাখেন, এসপিএফ তাঁদের কি আদৌ কোনও কাজে লাগে? এসপিএফ হল আল্ট্রাভায়োলেট 'বি' রশ্মি আটকানোর মাপ। সাহেবরা আল্ট্রাভায়োলেট 'বি' রশ্মি কতটা আটকানো গেল তাই নিয়েই চিন্তিত, কেননা আল্ট্রাভায়োলেট 'বি' রশ্মি মূলত ফর্সা ত্বকে সানবার্ন তথা রোদে-পোড়া করে, ত্বক-ক্যানসার করে। সুতরাং তাঁরা আল্ট্রাভায়োলেট 'বি' কতটা আটকায় তার পরিচিতি হিসেবে সানস্ক্রিনের গায়ে 'এসপিএফ' লেবেল সাঁটার নিয়ম বানিয়েছেন। কিন্তু রোদে রং কালো করে সূর্যালোকের যে অংশ, সেটা মূলত আল্ট্রাভায়োলেট 'বি' রশ্মি নয়। সেটা আল্ট্রাভায়োলেট 'এ' রশ্মি। সুতরাং আমরা যখন ফর্সা হওয়ার জন্য সানস্ক্রিন মাখছি, তখন এসপিএফ দেখে সানস্ক্রিন বাছলে, সেটা কেমিস্ট্রি পড়ে ফিজিক্সের পরীক্ষা দিতে যাবার মতো হয়ে যাবে। এটা অবশ্য অনামিকা দে-র জন্যও সত্যি, কেননা আল্ট্রাভায়োলেট 'এ' রশ্মি মেলাজমার জন্য আল্ট্রাভায়োলেট 'বি'-র চাইতে কম ক্ষতি করে, এমন জানা যায়নি। সুতরাং রোদে রং কালো করা ঠেকানোর জন্য দেখতে হবে সানস্ক্রিনটি আল্ট্রাভায়োলেট 'এ' রশ্মি কতটা ঠেকাতে পারে। আশ্চর্য হল, আমাদের দেশে ফর্সা হওয়ার জন্য, বা মেচেতার মত কালো দাগ ঠেকানোর জন্যই সানস্ক্রিনের ব্যবহার বেশি, অথচ কোম্পানিগুলো এসপিএফ বেশি বলে সেটা ভাল, এমন বিজ্ঞাপন করছে, মানুষও বিনা বাক্যব্যয়ে সেটা 'বুঝে' যাচ্ছেন; এমনকী ডাক্তাররাও এসপিএফ-নামে গদগদ।

একটি তথ্য দিই। আল্ট্রাভায়োলেট 'বি' ত্বক ক্যানসার করার ক্ষেত্রে বেশি ক্ষতিকর হলেও, সমতলে সূর্যালোকে মোট আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির মধ্যে শতকরা ৯৫-৯৮ ভাগ হল 'এ', এবং বাকি ২-৫ ভাগ হল 'বি' রশ্মি। অথচ সেই 'এ' রশ্মি, যেটা আমাদের রং কালো করে, সেটা কতটা আটকাচ্ছে, এমনকি আদৌ আটকাচ্ছে কি না, এটা না জেনেই আমরা ফর্সা হওয়ার আশায় সানস্ক্রিন বাছি। তা হলে কি আল্ট্রাভায়োলেট 'এ' রশ্মি ঠেকানোর ক্ষেত্রে কোনও সানস্ক্রিন কতটা কাজের সেটা মাপার কোনও পদ্ধতি নেই? আছে, কিন্তু যেহেতু কালো-হতে-চাওয়া সাহেবদের কাছে সেটা তুলনায় কম গুরুত্বের, আমরাও সেটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাই নি এতোদিন।

আমাদের দেশে ওষুধ কোম্পানির কিছু কিছু সানস্ক্রিন এখন ব্রিটেনের 'বুটস স্টার রেটিং' দিয়ে লেবেল লাগাচ্ছেন। 'বুটস স্টার রেটিং' মাপার সময়ে কিন্তু কোনও মানুষও, বা জীবিত কিছুর উপর পরীক্ষা করা হয় না। পরীক্ষাগারে দেখা হয়, সানস্ক্রিনটির স্তর আল্ট্রাভায়োলেট 'বি' রশ্মির তুলনায় আল্ট্রাভায়োলেট 'এ' রশ্মি কতটা আটকাতে পারছে। মানুষের ত্বকে ব্যাপারটা হুবহু পরীক্ষাগারের মতো হয় না। সে যা হোক, 'বুটস স্টার রেটিং'-এ একটা মাত্র স্টার সবচেয়ে কম আল্ট্রাভায়োলেট 'এ' রশ্মি থেকে সুরক্ষা দেয়, পাঁচটা স্টার দেয় সবচেয়ে বেশি। তিনটির কম স্টার গ্রহণযোগ্য নয় বলে ধরা হয়। জাপানে অন্য একটি পদ্ধতি বার করা হয়েছে। সেটিতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কিছু মানুষের ত্বকে সানস্ক্রিন মাখার ফলে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি 'এ' (UVA) দ্বারা ত্বকে 'ট্যান' বা কালো হওয়া কতটা আটকানো গেল, সেটা মাপা হয়, এবং সেটাই সানস্ক্রিনের আল্ট্রাভায়োলেট 'এ'-র 'জাপানি স্ট্যান্ডার্ড'। হয়তো খোলা ত্বকে এক ঘন্টা আল্ট্রাভায়োলেট 'এ' দিলে সেটা কালো হয় যায়, কিন্তু সানস্ক্রিন লাগিয়ে আল্ট্রাভায়োলেট 'এ' দিলে ত্বক কালো করতে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে, তবে ওই সানস্ক্রিনের আল্ট্রাভায়োলেট 'এ'-র 'জাপানি স্ট্যান্ডার্ড' হল 'PA++' । যে সানস্ক্রিন আল্ট্রাভায়োলেট 'এ'-র থেকে সুরক্ষা ২ থেকে ৪ গুণ দেয়, তার গায়ে লেবেল লাগানো হবে 'PA+'। এই সুরক্ষা ৪-৮ গুণ হলে, তার গায়ে লেবেল লাগানো হবে 'PA++'। আর এই সুরক্ষা ৯ গুণের ওপরে হলে, তার গায়ে লেবেল লাগানো হবে 'PA+++', সেটাই সর্বোচ্চ।

আমাদের দেশে যে সব কারণে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা হয়, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্ট্রাভায়োলেট 'এ' আটকানোর দরকার বেশি। তাই আমাদের সানস্ক্রিনে এসপিএফ কত, সেটা জানার চাইতে আল্ট্রাভায়োলেট 'এ'-র 'জাপানি স্ট্যান্ডার্ড' 'PA+++' কত দেখুন, অন্তত 'PA++' সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। কিন্তু সব ক্ষেত্রে সেটা আপনি দেখতে পাবেন না। সেক্ষেত্রে 'বুটস স্টার রেটিং' দেখুন। ফর্সা হওয়া, কিংবা কালো দাগ আটকানো যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটাই কাজের জিনিস, এসপিএফ নয়। সমুদ্রে গিয়ে রোদে-পোড়া আটকাতে চাইলে এসপিএফ দেখুন, কিন্তু সেখানে গিয়ে কালো হওয়া আটকাতে চাইলে দেখুন 'PA+++' বা 'বুটস স্টার রেটিং'।

এখানেই শেষ নয়। বাইরে বেরোনোর আধঘণ্টা মতো আগে সানস্ক্রিন বেশ পুরু করে মাখতে হবে, তারপর অন্তত দুঘন্টা অন্তর আবার লাগাতে হবে, তবেই আপনি বিক্রেতা-বিজ্ঞাপিত এসপিএফ ও আল্ট্রাভায়োলেট 'এ' থেকে সুরক্ষা পেতে পারেন। পুরোটা বোধ করি কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং যতটা সম্ভব রোদে বেরোবেন না, বেরোলে ছায়া খুঁজে চলুন, টুপি পরুন, কাপড়ে গা এবং যতটা পারা যায় ততটা মুখও ঢেকে রাখুন। এটা কিছু এমন অসম্ভব নয়—দিল্লির রাস্তায় গরম লু বইছে, মোটরসাইকেল বা সাইকেল-আরোহীরা দেহের সব জায়গা ঢেকে চলাচল করছেন—এটা তো আমরা দেখেই থাকি। দিনের বেলা বাইরে বেরোলে এ রকম যতটা সম্ভব করে, তারপর সানস্ক্রিন ব্যবহারের কথাটা ভাবাই বোধ করি সমীচীন।

উত্তর দিয়েছেন ডা. জয়ন্ত দাস, এমবিবিএস, এমডি, ত্বকরোগ বিশেষজ্ঞ।

কুইজ

প্রশ্ন :

সত্যি না কি মিথ্যা?

১। যে সব রক্তনালী থেকে অর্শের রক্ত বেরোয় সেগুলো প্রত্যেক মানুষের শরীরেই আছে।

২। আপৎকালীন জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি অসুরক্ষিত যৌন সঙ্গমের দু'-চার ঘণ্টার মধ্যে খেলে তবেই তা কার্যকর।

৩। শুধুমাত্র রাত্রে মশা কামড়ালে তা থেকে মশকবাহিত রোগ হয়।

৪। এ বছর 'মাতৃদুগ্ধ-পান সপ্তাহ' (Breast feeding week) ছিল ৭-১৩ আগস্ট, ২০১৩।

৫। স্তনের মধ্যে লাম্প বা টিউমার হল স্তন ক্যানসারের সুনির্দিষ্ট ও নির্ভুল লক্ষণ।

৬। বাচ্চাদের বোতলের দুধ খাওয়ালে তার কানের ভেতর সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে।

৭। চওড়া হাড় থাকার জন্য কিছু নবজাতকের ওজন স্বাভাবিকের চাইতে বেশি হয়।

৮। মলদ্বার দিয়ে রক্ত পড়ার বিভিন্ন কারণের মধ্যে 'ক্রোনস ডিজিজ' (Crohn's disease—একটি অন্ত্রের প্রদাহজনিত অসুখ) অন্যতম।

৯। ব্রণ অ্যালার্জি-ঘটিত অসুখ, আর তেল-জাতীয় খাবারে সেই অ্যালার্জি বাড়ে।

১০। সোডা-ওয়াটার খেয়ে পেটে গ্যাস জমা আর অ্যাসিড হওয়া আটকানো যায়।

জানেন কি?

১১। গ্যাস্ট্রিক আলসার হবার পিছনে যে এইচ পাইলোরি (*H pylori*) ব্যাক্টেরিয়ার ভূমিকা আছে সেই ব্যাপারটা কারা আবিষ্কার করেন?

১২। মিউজিসিয়ান নার্ভ (Musician nerve) কোনটি?

১৩। কৃষিকর্মের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের মাঠ ইত্যাদির ধুলো থেকে থার্মোফিলাস অ্যাকটিনোমাইসেটস (*Thermophilus actino-mycetes*) নামক জীবাণু থেকে অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়াজনিত এক প্রকার ফুসফুসের রোগ হয়। তার নাম কী?

১৪। ভারতে অন্ধত্বের সবচেয়ে বড় কারণ কোনটি?

১৫। বিশ্বের অ্যাথলিটদের মধ্যে ওষুধজাতীয় দ্রব্যগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বেশি অপব্যবহৃত হয়?

উত্তর : ১৩ পাতায়।

এবার কুইজটি তৈরি করেছেন অভিষেক দাস, পুণেতে একটি মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস পাঠরত ছাত্র।

With Best Compliments from :

KLOSTER Pharmaceuticals

B/13/H/3, Braunfeld Road
Kolkata 700027
Phone : 0332449-0144
Mob : 9830663724
Email : kloster_ pharma@yahoo.co.in
Website : klosterpharma.com

এক গাঁয়ের ডাক্তারের গল্প

ষষ্ঠ পর্ব

এ দেশের গ্রামে চিকিৎসা-পরিষেবার হাল খুব খারাপ। সরকারি যেসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর গ্রামীণ হাসপাতাল আছে সেখানে ওষুধ, যন্ত্রপাতি প্রায় কিছুই নেই, আছে শুধু জঞ্জালের স্তূপ। শহরের মাঝখানে মেডিকেল কলেজে বসে পাঁচ-দশ বছর পড়াশুনো করে যখন নতুন ডাক্তারেরা গ্রামের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান তখন অনেকেই পালানোর পথ পান না। তবে সকলেই তো পালানোর লোক নন, তাঁরা শেষ অবধি না দেখে ছাড়েন না—সেই দেখার আর বাঁচার সত্যি কাহিনি শোনাচ্ছেন **ডা. অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত।**

আগে যা জেনেছি : এই সংখ্যায় 'এক গাঁয়ের ডাক্তারের গল্প'-র ষষ্ঠ কিস্তি। প্রথম পাঁচ কিস্তিতে আমরা শুনেছি 'কলকাতার ছেলে' অনিরুদ্ধ মেডিকেল কলেজে বছর-আষ্টেক ধরে পড়াশুনা আর শিক্ষানবিশি করার পর দিল্লিতে বড় হাসপাতালের আরামের চাকরি ছেড়ে হঠাৎ করেই ১৯৯০ সালে রাজ্য-সরকারের চাকরি নিয়ে কলকাতা থেকে দূরে, ডায়মন্ডহারবারের কাছাকাছি পাণ্ডববর্জিত পাড়াগাঁ বেলপুকুরে গেঁড়ে বসলেন।

ডাক্তারের কোয়ার্টার ভাঙাচোরা, সাপের আড্ডা, তাই ছোটো কোয়ার্টারে থাকার ব্যবস্থা করলেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশেই ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার আছে, সুতরাং প্রায় গায়ের জোরেই সেখান থেকে লাইন টেনে হাসপাতালে ইলেকট্রিক কানেকশন আনলেন। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় ওষুধ-বিষুধ আনতে গিয়ে জেলার প্রধান মেডিকেল অফিসারের বাবুরা প্রায় সব ওষুধ 'সাপ্লাই নেই' লিখে দিলেন।

এই সবের মধ্যেও রোগী দেখা আর রোগ সারানোর ফলে মানুষজন ডাক্তারকে ভালবেসে ফেললেন। ডাক্তার যেটুকু সামান্য যন্ত্র আর সুবিধা পেলেন তা কাজে লাগিয়ে, গতানুগতিক নিয়ম ভেঙে, কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে মাথায় রেখে, সার্জারি করতে লাগলেন, আর রোগীদের বাঁচানো গেল। শুরুতে ছিল খালি বন্ধ্যাত্বকরণ অপারেশন—গ্রামের হাসপাতালে সামান্যতম ব্যবস্থা থাকে না, রোগী ভোগে বীজাণু-সংক্রমণে। অনিরুদ্ধ ও তাঁর ডাক্তার স্ত্রী কনীনিকা সংক্রমণ রুখতে উপযোগী ব্যবস্থা কার্যকর করলেন। অন্য হাসপাতাল-ফেরত অপারেশনের রোগী প্রথমে বাধ্য হয়ে, তারপর ডাক্তারের ওপর প্রায় গায়ের জোর খাটিয়ে, বেলপুকুরে বেশ বড় অপারেশন করিয়ে ছাড়ল, অনেকের প্রাণ বেঁচে গেল। হাসপাতাল-কর্মী আর গ্রামের মানুষ জেনারেটর ভাড়া করে, কেরোসিনের ব্যবস্থা করে, অপারেশন চালু রাখলেন— নিজের উৎসাহে কঠিন কাজ শিখে নিলেন, সম্পূর্ণ অজ্ঞান করে 'বড়' অপারেশন করা হল। রোগীর ভালভাবে যত্ন করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের দাইরা অপারেশনের যন্ত্রপাতি ও অন্য জিনিসপত্র বীজাণুমুক্ত করতে শিখে নিলেন। অপারেশনের পরে রোগীদের তাড়াতাড়ি ছুটি দিয়ে দেবার সময় অনিরুদ্ধ নিজে রোগীর ব্যান্ডেজ পালটে বাড়ির লোকেদের রোগীর যত্ন কীভাবে করতে হবে বুঝিয়ে দিতেন। বেলপুকুর হাসপাতালে একটা ভাঙাচোরা প্রসবঘরে অপারেশন করতে হত—কিন্তু এই সবের ফলে বীজাণু-সংক্রমণের হার মেডিকেল কলেজের চেয়ে কম ছিল। প্রয়োজনের তাগিদে তাড়াতাড়ি ছুটি দেওয়া শুরু করলেও অনিরুদ্ধ দেখলেন বিলেতে রুরাল সার্জারি আর ডে-কেয়ার সার্জারি তাঁর কাজের সাথে একই মূলমন্ত্রে গাঁথা।

গ্রামের হাসপাতালে পথ-দুর্ঘটনায় পড়া মানুষের ইমার্জেন্সি অপারেশন করা অসম্ভব ব্যাপার। সাধারণ সার্জারির কথা ভেবেই অনিরুদ্ধ টিম তৈরি করেছিলেন, কিন্তু সেই টিম জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করতে শেখে, পথ-দুর্ঘটনায় আহত মানুষদের দ্রুত চিকিৎসা করে বাঁচানো সম্ভব হয়। একটি ছেলের প্রস্রাবের নলের ভিতরকার অংশটি দুর্ঘটনায় ছিঁড়ে গেলে অনিরুদ্ধ বাধ্য হয়েই বেশ জটিল 'ইউরেথ্রোপ্লাস্টি' অপারেশন দু'টো ধাপে করলেন, রোগী ভাল হয়ে গেল।

আর এই সব কাজের ফল ফলল অভাবিত সব দিক দিয়ে। গভীর রাত্রের বাসে ডাকাতি হল, অনিরুদ্ধর ঘড়ি নিয়ে নিল ডাকাত। ক'দিন পরে সেই ডাকাতের বাবা অনিরুদ্ধর বাসায় এসে ক্ষমা চেয়ে নিজের কেনা একটি ঘড়ি দিতে এলেন। এক ডাক্তারবাবু মানুষের কাছে কীভাবে 'অন্য মানুষ' হয়ে ওঠেন, সেটা আমরা দেখলাম।

হাসপাতালের মধ্যে খানাখন্দ-বোঝাই একটা মাঠে ফুটবল খেলতেন ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী আর গ্রামবাসীরা। হাসপাতালের নিজস্ব একটা জমি ছিল, সেটা কাজে লাগছিল না; সেই জমিটাতে মাটি ফেলে ফুটবল-মাঠ করার খরচ অনেক। হাসপাতালের পাশে রেললাইন তৈরি হচ্ছিল, এক রাতে সে-কাজের ঠিকাদার ভদ্রলোকের এক কর্মীর স্ত্রীর অন্ত্রনালি ফুটে হয়ে 'পেরিটোনাইটিস' হয়ে গেল, ঠিকাদারবাবু মহকুমা হাসপাতালে যেতে রাজি নন। অগত্যা অপারেশন হল, দক্ষতা ও যত্নে রোগী ভাল হয়ে গেলেন। কিছু দিন পরে ঠিকাদার ভদ্রলোক এসে হাসপাতালের জন্যে কিছু করে দিতে চাইলে ডাক্তারবাবু হাসপাতালের চাষের জমিতে মাটি ফেলে ভরাট করে ফুটবল মাঠ করিয়ে নিলেন।

কাকদ্বীপ হাসপাতাল থেকে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা রোগীকে নিয়ে এক অটোরিকশ রোগীর অবস্থা সঙ্গীন দেখে রাস্তায় বেলপুকুর হাসপাতালে ঢুকে পড়লেন। ডাক্তার সন্দেহ করলেন, 'রাপচারড এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি'। ভয়ানক ইমার্জেন্সি, কিন্তু রোগীর লোকজন ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে যাবে না। ডাক্তার খুব দ্বিধা করেও রোগীর অপারেশন করলেন—'এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি'ই বটে। অপারেশন করে রোগীকে বাঁচানো গেল—দেরী হলে রক্তপাতের ফলে রোগীর মৃত্যু হতে পারত।

কিন্তু এই ডাক্তারেরও ভুল হয়েছে। মেডিকেল কলেজে লেবার রুমে কাজ শেখেননি ভাল করে, তাই বেলপুকুরে প্রথম প্রসবের দিন থেকেই তাঁর

টেনশন, রোগীকে ভর্তি করে ধাত্রীবিদ্যার বই পড়া। একদিন দূরের এক গ্রাম থেকে এক অন্তঃসত্ত্বা এলেন, ডাক্তার ভাবলেন স্বাভাবিক প্রসব হবে। কিন্তু প্রসব এগোয় না; কুলপি হাসপাতালে রেফার করবেন কি না ভাবতে ভাবতে দেরি হয়ে গেল; শেষে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেন। অনেক রাতে মেয়েটির বাবা ফিরে এসে বললেন, বাচ্চাটিকে বাঁচানো গেল না, আগে এনে সিজার করলে ঠিক হত। অনিরুদ্ধ বলতে চাইলেন, তাঁরও কিছু ভুল আছে, কিন্তু ভদ্রলোক বললেন, না, অনিরুদ্ধবাবু রাত্রি জেগে অনেক চেষ্টা করে ছিলেন, তাঁর নামে কোনও অপবাদ তিনি শুনবেনই না। এরপর অনিরুদ্ধ কুলপি হাসপাতালে দুজন দক্ষ নার্সের কাছে প্রসব করানোর প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করলেন। এরকম ভুল আর হয়নি।

দক্ষতার পরীক্ষা

প্রতি শনিবার হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে মিটিং করতে হত। ওদেরই একজন এক দিন নিজের সাত বছরের ছেলেকে নিয়ে এল আমাকে দেখানোর জন্যে। বলল ওর ছেলের না কি কোনও দিকেরই 'টেসটিস', অর্থাৎ অণ্ডকোষ, পাওয়া যাচ্ছে না। পরীক্ষা করে দেখলাম যে ছেলেটির দুই দিকেই অণ্ডকোষ অণ্ডথলিতে নামে নি। ডান দিকেরটা কুঁচকির ঠিক নীচে আছে বলে মনে হল কিন্তু বাম দিকেরটা পেটের ভেতরেই রয়ে গিয়েছে। বললাম, ''এত দিন ফেলে রেখেছ কেন? এটা আরও আগেই অপারেশন করে নেওয়া উচিত ছিল। আর বেশি দেরি কোরো না—পরের সপ্তাহে অপারেশনের তারিখে করে দেব।''

পরের সপ্তাহে কিছু অসুবিধার জন্য সে ছেলেকে নিয়ে আসতে পারল না, তার পরের সপ্তাহেও না। নানা কাজের চাপে আমারও মনে ছিল না। ইতিমধ্যে কিন্তু এই অপারেশনই বেশ কয়েকটা হয়ে গেল—এই রোগীদের মধ্যে বেশ কয়েক জন কিন্তু বেলপুকুরের সেই কর্মীর কাছে খবর পেয়েই এসেছিল। বছর খানেক বাদে সেই কর্মী আমাকে এক দিন বলল, ''দাদা, ছেলেকে আর একবার নিয়ে আসব?'' বললাম, ''কী হবে দেখিয়ে? তুমি অপারেশনটা তো আর করাবে না—শুধু শুধু দেখিয়ে লাভ নেই''। সে ভীষণ কাঁচুমাচু মুখে বলল, ''না দাদা, এবার আর মিস হবে না — যে দিন বলবেন সেই দিনই অপারেশনটা করিয়ে নেব।''

দু' সপ্তাহ বাদে এক দিকের অপারেশন হয়ে গেল, আর তার তিন মাস বাদে অন্য দিকটাও করে দিলাম। বেশ কয়েক দিন বাদে একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, ''অপারেশন করাতে এত দেরি করলে কেন?'' শুনলাম যে ওর শ্বশুর-সম্পর্কিত কোনও একজন ডাক্তারবাবু বলেছিলেন যে এই অপারেশন খুব বিপজ্জনক। এই ডাক্তারবাবু প্রবীণ আর কাকদ্বীপ এলাকায় মোটামুটি ভাল পশার। আমার কথা যদিও তার ঠিক বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু শহুরে কম বয়সী ডাক্তারের জ্ঞান আর হাতের ওপর কতটা ভরসা করা যাবে বুঝতে পারছিল না। তাই পরীক্ষা করার জন্য ওর ছেলের মতো আরও রোগী খুঁজে এনে বেলপুকুর হাসপাতালে অপারেশন করিয়ে দেখে নিচ্ছিল। একবছর ধরে ও ধৈর্যের সঙ্গে ওই রোগীরা কেমন আছে, সেটা দেখে গেছে। তারপরও সেই প্রবীণ ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করার পরে তবেই নিজের ছেলের অপারেশনের ঝুঁকি নিতে রাজি হয়েছে।

ভেবেছিলাম মেডিকেল কলেজে আর দিল্লির বড় হাসপাতালে কাজ করে এসেছি, আমি যা বলব সেটাই মানুষ মনে করবে শেষ কথা। কিন্তু এ বার বুঝলাম যে সাধারণ মানুষের ভরসা অর্জন করতে গেলে, তাদের পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। তার জন্যে লাগে ধৈর্য, সময় আর আন্তরিকতা। এটাও অনুভব করলাম যে রোগীরা স্পেশালিস্ট আর সুপার-স্পেশালিস্টদের কাছে দেখাতে গেলেও, তাদের পাড়ার বা পারিবারিক ডাক্তারদের পরামর্শের ওপরে ভরসা সবচেয়ে বেশি। মনে হয় সেটাই ঠিক, কেননা সাধারণ মানুষের পক্ষে স্পেশালিস্ট সুপার-স্পেশালিস্টদের ব্যক্তি হিসেবে, মানুষ হিসেবে, জানা কঠিন। তাঁদের বিশেষ জ্ঞান আছে সন্দেহ নেই, মানুষের শরীরের সমস্ত খন্ডকে তাঁরা আলাদা আলাদা করে খুব ভাল জানেন। কিন্তু মানুষকে তাঁদের সবাই কতটা মানুষ হিসেবে নেন সেটা বোঝা শক্ত। বলছি না যে স্পেশালিস্ট মানেই তিনি মানুষকে যন্ত্রের মতো দেখেন, কিন্তু পারিবারিক ডাক্তারদের মতো সেই মানবিক সম্পর্ক হয় কি? চিন্তার বিষয় এই যে ক্রমশ এই পারিবারিক ডাক্তার বা জেনারেল ফিজিসিয়ানদের সংখ্যা কমেই চলেছে— ডাক্তাররা সবাই এখন স্পেশালিস্ট হতে চান, আর মানুষও যেন সাইনবোর্ডের ডিগ্রির ওপরে বেশি আস্থা রাখছেন আজকাল। কিন্তু মানবীয় সম্পর্কের তো কোনও ডিগ্রি হয় না, সুতরাং মেশিন দেখছি না মানুষ দেখছি সে বোধ কার কতটা, সেটা কোন নিক্তিতে মাপব?

সার্জিক্যাল টিম

বেলপুকুর হাসপাতালে অপারেশন শুরু হওয়ার বছর-দুয়েকের মধ্যেই কাজের একটা ছন্দ তৈরি হয়ে গেল। সপ্তাহের দু'টো দিন অপারেশন-এর জন্য নির্ধারিত ছিল—শুক্রবার বন্ধ্যাকরণ আর বৃহস্পতিবার অন্যান্য ছোটবড়ো অপারেশন। বেলপুকুর হাসপাতালের কর্মীরা—সরকারি আর স্বেচ্ছাসেবী—নিজেদের কাজ অথবা দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছিলেন, আমাকে করতে হয়নি। অবশ্য নিয়ম-কানুন মেনে এই দায়িত্বগুলো বন্টন করতে পারতামও না, কারণ প্রত্যেকটি কর্মীই তাদের নিয়মমাফিক কাজের অতিরিক্ত করতেন— স্বেচ্ছায়, উৎসাহের সাথে আর অনায়াসে। তখন নামটা না জানা থাকলেও, এই বোধহয় প্রকৃতপক্ষে মাল্টিস্কিলিং।

প্রতি সপ্তাহেই ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় ১০টা অপারেশন হত। অন্য যে কোনও সরকারি হাসপাতালে এই কাজ করার জন্যে অন্তত তিনটে শিফটে বিভিন্ন স্কিলের কর্মী দরকার হত, কিন্তু বেলপুকুর হাসপাতালের এই ১০-১২ জন কর্মীই অসাধারণ ছিলেন। আগের রাত্রে সব কিছু অটোক্লেভ করে অপারেশনের দিন সকাল থেকে জেনারেটর ভাড়ার ব্যবস্থা, রোগীদের থাকার ব্যবস্থা, অপারেশন করতে সাহায্য করা—সবই ওঁরা করতেন। ওঁরা এত দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন বলেই তথাকথিত বড় অপারেশনও অনায়াসে হয়ে যাচ্ছিল। কাজের ভাগটা মোটামুটি এই রকম ছিল—

আশিস (সরকারি) — অজ্ঞান করার দায়িত্বে। মেডিকেল কলেজের পরে ওঁর থেকে ভাল ওপেন ইথার পদ্ধতিতে অজ্ঞান করতে কাউকে দেখিনি।

সুলেমান (সরকারি) আর নাসির (স্বেচ্ছাসেবী) — অপারেশন-এর যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখা আর অপারেশনের সময়ে সাহায্য করা। আমার দেখা খুব কম ডাক্তারই এত ভাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল। কখন কোন যন্ত্রটা

লাগবে, কখন মপ দিয়ে মুছতে হবে বা মোছা যাবে না ওঁদের বলতে হত না। অথচ আমি ওখানে যাওয়ার আগে ওঁরা কেউই কোনও দিনই অপারেশন দেখেননি, ট্রেনিং তো দূরের কথা।

রঞ্জিতা-কমলা-সিন্ধু (৩ জনই স্বেচ্ছাসেবী)—অপারেশনে ব্যবহার করা কাপড়, যন্ত্রপাতি, মপ, গ্লাভস ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে রাখতেন, প্রথম থেকে শেষ অপারেশন হওয়া পর্যন্ত। তার পরে সারা রাত ধরে রোগীদের নার্সিং করতেন।

রামপাল হেলা (সরকারি)—বৃহস্পতি থেকে শনিবার পর্যন্ত হাসপাতাল পরিষ্কার করে রাখতেন, অসংখ্য বালতি ভরে জল বয়ে নিয়ে আসতেন। শনিবার সব রোগীর ছুটি হয়ে গেলে ওকে অবশ্য তিন দিন আর দেখা যেত না, কারণ জিজ্ঞাসা করবেন না।

দুর্গা তান্ত্রি (সরকারি)— বেলপুকুর হাসপাতালের একমাত্র নার্স। কিন্তু দুই চোখে ছানির ফলে কিছুই দেখতে পারতেন না। কিন্তু নিয়মিত হাসপাতালে আসতেন, আর অপারেশন থিয়েটারে একটা হাতপাখা দিয়ে মাছি তাড়াতেন। অবশ্য মাছিটা কোন দিকে ঘোরাঘুরি করছে সেই সংবাদটুকু বলে দিতে হত।

কৌশল্যা (সরকারি)— সারাদিন ধরে গজ আর ব্যান্ডেজ কেটে কেটে আঙুলে কড়া পরে গিয়েছিল।

বাসুদেব (সরকারি)— জেনারেটার ভাড়ার ব্যবস্থা, রোগীদের থাকার ব্যবস্থা, অপারেশন-এর ফাঁকে ফাঁকে যাতে চায়ের অভাব না হয়, রোগীদের কাগজগুলো গুছিয়ে রাখা আর বড় অপারেশন চলাকালীন মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে আত্মীয়দের খবর দিয়ে আশ্বস্ত করা— বেলপুকুর হাসপাতালকে পেশেন্ট-ফ্রেন্ডলি হাসপাতাল করে তোলায় ওঁর বোধহয় অবদান সবচেয়ে বেশি ছিল।

ফিতে কৃমির জন্যে অপারেশন

সুলেমান রফিকের টিকিটটা নিয়ে এসে আমাকে বলল—''দাদা, এটা ভেতরে দেখার জন্যে রাখব?'' আমি আউটডোরে যাঁদের শুইয়ে অথবা যন্ত্র দিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে হত, তাঁদের টিকিটটা আলাদা করে রাখতাম—১০/১২টা জমে গেলে তাঁদের একটা আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে পর পর দেখতাম।

জিজ্ঞাসা করলাম— ''কেন''? সুলেমান বলল— ''পেটে বোধহয় টিউমার হয়েছে— বলছে বলের মতন কিছু একটা হাতে লাগছে।'' একটু বিরক্তই হলাম। সোমবারের আউটডোর, অনেক রোগী। তাও বললাম— ''ঠিক আছে কিন্তু আর কারও জন্য বোলো না।'' সুলেমানের অনেক আত্মীয়-কুটুম্ব আর তার থেকেও বেশি পরিচিত। প্রতিদিন অন্তত ২৫-৩০ জন রোগী এসে সলে-কাকার খোঁজ করত।

রফিক'কে শুইয়ে পেটে হাত দিয়েই লিভারে একটা বড় গোল টিউমার হাতে অনুভব করতে পারলাম। ধারণা হল এটা ক্যানসারই হবে। রফিক'কে বললাম একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে নিয়ে আসতে। সুলেমান'কে আমার সন্দেহের কথা বলে পরামর্শ দিলাম কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে। সুলেমান বলল ''না দাদা, ও যাবে না— এক্কেবারে গরিব। আল্ট্রাসোনোগ্রাফি-র টাকাটাও আমাকে ব্যবস্থা করতে হবে''। সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ''ওর বোন-টোন কাউকে বিয়ে করছ নাকি?'' জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে সুলেমান বলল, ''না দাদা, আমি যখন গোসাবা হাসপাতালে চাকরি করতাম ওর বাবার কাছে থাকতাম। খুব দুঃখী ওরা''।

পরের দিনই রফিক আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে নিয়ে এল। রিপোর্টে লেখা আছে 'হাইডাটিড সিস্ট' হয়েছে, ক্যান্সার নয়। মানুষের শরীরে কুকুরের ফিতে ক্রিমি ঢুকে রক্তে প্রবেশ করলে সেটা বেশির ভাগ সময়ে লিভারের ছাঁকনিতে আটকে গিয়ে বড় হতে শুরু করে। মাঝেমাঝে ফুসফুসেও চলে যায় আর সেখানেও অনুরূপ সিস্ট তৈরি হয়। আমি মেডিকেল কলেজের জীবনে দু'টো 'হাইডাটিড সিস্ট' অপারেশন দেখেছিলাম--- দুজনেই মারা যান অপারেশন-এর পরে রক্তক্ষরণের ফলে।

'হাইডাটিড সিস্ট' অপারেশন-এর প্রধানত তিনটে ভয় থাকে—

১। 'হাইডাটিড সিস্ট' ফেটে গিয়ে শরীরে বা রক্তে মিশে গেলে, সাংঘাতিক অ্যালার্জিক রি-অ্যাকশন হয় আর তার ফলে রোগী মারা যেতে পারেন।

২। সিস্টের ভেতরে অনেকগুলো শিশু সিস্ট থাকে—এগুলো থেকে গেলে আবার নতুন করে 'হাইডাটিড সিস্ট' তৈরি হয়। এই শিশু 'সিস্ট'গুলো এতই ছোট যে খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না।

৩। লিভার ভীষণ নরম, কিন্তু প্রচুর রক্ত চলাচল হয়। তাই লিভারের অপারেশন করলে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকে অথচ নরম হওয়ার ফলে সেলাই করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করাটা মুশকিল।

যা-ই হোক, ক্যানসার না হলেও এই অপারেশন বেলপুকুর হাসপাতালে করার প্রশ্নই নেই। অসুবিধা যাতে না হয় তাই মেডিকেল কলেজে পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার পরিচিত একজন সিনিয়র দাদাকে চিঠিও লিখে দিলাম। পরের দিন সুলেমান এসে আমাকে ধরল— ''দাদা, ওরা কলকাতায় পারবে না। একেবারে কিস্যু নেই। ওর অপারেশনটা এখানে করে দিন।'' বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কেন বড় হাসপাতাল ছাড়া করা যাবে না—রক্ত দিতে হতে পারে, শকে টেবিলেই মরে যেতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু ও বোধহয় বুঝতে পারল না যে এই অপারেশানটা করার ক্ষেত্রে আমার নিজেরই মনোবল

নেই। সাড়ে চারটে বাজতেই ফুটবল খেলতে মাঠের দিকে রওনা দিলাম। আজকে সুলেমানও লুঙিটা মালকোঁচা মেরে খেলতে চলে এল। ওর খেলার দুটো বৈশিষ্ট্য ছিল—ও আমার দলেই খেলবে আর বলে যত জোরে লাথি মারতে পারত তার থেকে অনেকগুণ জোরে হাঁকডাক করত। আমরা জিতলে মাঠ থেকে ফেরার পথে সবাইকে বোঝাতে বোঝাতে আসত যে বেলপুকুর হাসপাতালের কর্মীরা সব কিছুতেই সেরা। হারলেও অবশ্য ওকে দমানো যেত না, কারণ বিপক্ষ দল হয় ফাউল করেছে নয়তো আমাদের দলের (আমি বাদে) কেউ একটা বাজে খেলেছে।

স্নান করে কোয়ার্টারের বারান্দায় বসতেই, সুলেমান চা আর সিগারেট নিয়ে হাজির। এটাও একটা রীতি ছিল—সারাদিন চা আমি খাওয়াতাম কিন্তু বিকেলের এই দায়িত্বটা সুলেমানের। বলল, ''দাদা, রফিকটা বড্ড কান্নাকাটি করছে। ওর বাড়ির লোকেরা বলেছে ডাক্তারবাবুর হাতে ছাড়া করাবে না—তাতে যা হবার হোক''। আমি রাজি হলাম না। পরের দিন আশিস, নাসির, বাসুদেব আবার রফিকের অসুখের ব্যাপারে জানতে চাইল কিন্তু এই অপারেশনটা যে বেলপুকুরে করা যাবে না মানতে রাজি হল না। ওদের আমার শল্যচিকিৎসায় দক্ষতার ওপরে অগাধ ভরসা আর সেই সঙ্গে একটা নতুন অপারেশন দেখার প্রবল আগ্রহ।

রফিক কিন্তু কলকাতায় গেল না। প্রত্যেক সপ্তাহে আউটডোরে এসে খুব দুঃখী দুঃখী ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত আর সুলেমান-আশিস'রা আমাকে সিদ্ধান্ত পালটাবার আর্জি জানাত। সুলেমান আর বাসুদেবের কথায়, ''আমরা এত ডেঞ্জার সব অপারেশন করলাম, একটাও ফেল নেই— এটা দাদার কাছে কোনও ব্যাপারই না। আমাদের কাছে অন্য সব সার্জেন ফেল।'' যত দিন যাচ্ছিল, অপারেশনটা করার ইচ্ছাটা আমার মনেও বাড়ছিল—প্রতি সপ্তাহে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি গিয়ে 'হাইডাটিড সিস্ট' নিয়ে পড়াশোনা করতে থাকলাম। মাস তিনেক বাদে রফিকের অপারেশন-এর তারিখ ঠিক করলাম।

আমার প্রথম 'হাইডাটিড সিস্ট' তাই সে দিন আর কোনও অপারেশন রাখলাম না—জানি না কী হবে, এই অপারেশন এই রকম জায়গায় করা ঠিক হচ্ছে কি না। কনীনিকার চিন্তা অনেক বেশি তাই সকালেই র‍্যানিটিডিন ট্যাবলেট খেতে বাধ্য হয়েছে। আর আমি আগের দিন রাত্রে সব কর্মীদের সাথে বসে অপারেশনের ধাপগুলো আলোচনা করেছি, এমন কি কোনও সময়ে স্যালাইন স্টোভে চাপালে ঠিক সময়ে ফুটতে শুরু করবে সেটাও রঞ্জিতা'দের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি।

অপারেশনটা শুরু হতেই কি করে জানি না, আমার সব সংশয় মিলিয়ে গেল। পেট খুলে লিভারের সিস্টটা দেখতে পাওয়া মাত্র, সুলেমান অনেকগুলো মপ (বীজাণুমুক্ত কাপড়) অ্যান্টিসেপটিক পভিডন আয়োডিনে ভিজিয়ে দিয়ে দিল। এই মপগুলো দিয়ে আমরা পেটের ভিতরে বাকি সমস্ত অঙ্গগুলো ঢেকে দিলাম, যাতে একটিও শিশু সিস্ট পেটের অন্য কোনও দেহযন্ত্রের কাছে পৌঁছতে না পারে। সিস্টটা কেটে বাদ দিতে কোনও অসুবিধে হল না। সঙ্গে সঙ্গে সুলেমান আর নাসির সব যন্ত্রপাতি, মপ আর অন্যান্য সরঞ্জাম পালটে ফেলল। ইতিমধ্যে বাসুদেব ফুটন্ত স্যালাইন নিয়ে প্রস্তুত। সুলেমান দুটো গ্লাভস পরে একের পর এক মপ সেই ফুটন্ত স্যালাইনে ভিজিয়ে আমাকে দিতে থাকল। লিভারের কাটা জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্যে এই গরম ভেজা মপই সবচেয়ে কার্যকরী। অপারেশন শেষ

প্রতি সপ্তাহেই ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় ১০টা অপারেশন হত। অন্য যে কোনও সরকারি হাসপাতালে এই কাজ করার জন্যে অন্তত তিনটে শিফটে বিভিন্ন স্কিলের কর্মী দরকার হত, কিন্তু বেলপুকুর হাসপাতালের এই ১০-১২ জন কর্মীই অসাধারণ ছিলেন।

হতে প্রায় দু'ঘন্টা লাগল। নাসির এই দু'ঘন্টা ধরে নিখুঁতভাবে দুই হাত দিয়ে 'হাইটাডিড সিস্ট' আর লিভার থেকে পেটের অন্যান্য অঙ্গগুলো সরিয়ে রেখেছিল। শুনে সহজ মনে হলেও দুই ঘন্টা ধরে কবজিটাকে ৯০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বাঁকিয়ে স্থির রাখা কত শক্ত কাজ সেটা যে কেউ পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝতে পারবে। এই কাজটা নিখুঁতভাবে করার ফলে আমার পক্ষে অপারেশন করাটা বেশ সহজ হয়ে গিয়েছিল। অপারেশন শেষ হতেই বাসুর হাঁকডাক আবার শোনা যেতে লাগল—''ভীম, কি হল ভাই—চা বানাতে এত সময় লাগে ভাই? আমরা এত বড় বড় অপারেশন করে দিচ্ছি আর তোমার একটা চা-অপারেশন করা গেলোনিকো?'' চা খেতে খেতে শুনতে হল, বাসু অপারেশন থিয়েটারে না ঢুকেও কত বড় অপারেশন হল, তার বিবরণ দিচ্ছে রফিকের পরিবারকে।

দশ দিন বাদে সেলাই কেটে দেবার পরে রফিককে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। এত বড় অপারেশন বেলপুকুরের মতন ছোট হাসপাতালে নির্বিঘ্নে করতে পারার কৃতিত্বের সিংহভাগ ওখানকার কর্মীদের। এর পরে অবশ্য এই রকম আরও ১২ জন রোগী পেয়েছিলাম— তাদের মধ্যে ৭ জনের অপারেশন করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি রোগীই অপারেশনের পরে ৬ মাস অন্তর নিয়মিত আমাকে দেখিয়ে যেত, এবং কারোরই নতুন করে সিস্ট তৈরি হয়নি। পরে দিল্লিতে রুরাল সার্জারির এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স-এ এই অপারেশনগুলো নিয়ে একটা পেপার পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, আর বেলপুকুরের সব কর্মীর হয়ে সেরা পেপারের পুরস্কারও নিতে হয়েছিল আমাকে।

লেখক পরিচিতি : ডা. অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত, এমবিবিএস, এখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জনস্বাস্থ্য-বিষয়ক কর্মসূচি রূপায়ণে কর্মরত।

চি ঠি প ত্র

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

প্রথমেই ধন্যবাদ ''ডা. প্রদীপ সরকার, এম.বি.বি.এস.'' গল্পটি প্রকাশের জন্য। উচ্চাঙ্গ সাহিত্যমূল্য কতটা সে বিচারে না গিয়েও বলা যায় গল্পটির ভাষ্য ঠিক এই সময়ে অনেক চিন্তা ও আলোচনার পথ খুলে দিয়েছে।

এখন স্পেশালিস্ট, সুপার স্পেশালিস্ট ডাক্তারির যুগে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রিধারী জেনারেল ফিজিশিয়ানদের বড় আকাল—অথচ আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এই গোষ্ঠীর 'ডাক্তারবাবু'-দের যাঁরা পুরো মানবশরীরটা অখণ্ডভাবে বোঝেন, রোগীর সব রকম বিপদেআপদে পাশে দাঁড়ান, পিঠে ভরসার হাত রাখেন, আর প্রয়োজনমতো বিশেষজ্ঞের কাছে 'রেফার' করেন। সেই পাড়ার ডাক্তারবাবু এখন বিরল প্রজাতি। চিত্রটা যদি পুরোপুরি এই গল্পের মতো হয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কোনও ডাক্তার স্বেচ্ছায় এই গোষ্ঠীভুক্ত হতে চাইবেন না। তবে কিছুট আশার কথা এটা যে গল্পের চিত্রটি আংশিক সত্য—পুরোটা এত হতাশাব্যঞ্জক নয়।

গল্পটি সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে একটা অভিমান, একটা কিছু না পাওয়ার বেদনা ও হতাশার জায়গায় দাঁড়িয়ে লেখা যা পাঠকের মনে একটা নঞর্থক ভাবনা সঞ্চার করতে বাধ্য। ডাক্তারের চেম্বারে ভাঙচুরের ঘটনাটি কোনও বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়—চিকিৎসক, শিক্ষক, অধ্যাপক, আধিকারিক সবাই এই দৌরাত্ম্যের শিকার। এই অসহিষ্ণুতা, এই সামাজিক ব্যাধির উৎস ও তার নিরাময় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অন্য বিশদ পরিসর প্রয়োজন।

ডা. সরকারের প্রধান আক্ষেপ কিন্তু ওই এক দিনের ঘটনা নিয়ে নয়। আক্ষেপটি অন্য জায়গায়—দু'পাতার গল্পে যেটা বার বার প্রতিধ্বনিত হয়। প্রথম দিকে ''চাকরি না করে শুধুই প্র্যাকটিস করি, প্র্যাকটিস তেমন জমেনি, মর্যাদা, প্রতিপত্তি ও আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করতে পারিনি''। শেষের দিকে—''মানুষ হিসাবে, এক জন সৎ, নীতিপরায়ণ, আদর্শবাদী, এথিক্যাল, লিগ্যাল, লজিক্যাল মানুষ হিসাবে থাকতে হলে নিম্নবিত্ত হয়েই থাকতে হবে।'' এই আর্থিক স্বচ্ছলতা বা উচ্চবিত্তের গণ্ডিটা কিন্তু বেশ অস্বচ্ছ। শুধু ডাক্তার কেন, যে কোনও পেশাদার মানুষ প্রথম থেকে চাকরি করলে একটা বাঁধাগতের জীবনের সঙ্গে একটা বাঁধা মাইনের প্রতিশ্রুতি তো থাকেই। আর চাকরি ছাড়া নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে একটা চ্যালেঞ্জ নিতেই হয়। এখনও, এই দুর্দিনেও বিশ্বাস করি না, ডাক্তারকে ''বড় প্র্যাকটিস বানাতে গেলে মরালিটির কোথাও না কোথাও, লজিকের কোথাও না কোথাও, এথিক্সের কোথাও না কোথাও, আইনের কোথাও না কোথাও, আইডিয়ালিজমের কোথাও না কোথাও আপস করতেই হবে।''

হ্যাঁ, আপস তো করতেই হবে। প্রতিনিয়ত প্রকৃতির সঙ্গে সুদীর্ঘ আপস করতে করতেই তো জীবজগতের এই বিবর্তন। এ বার আপসটি 'সু' না 'কু' সেটাই বিবেচনার।

প্রাক্তন মেয়রের বাড়িতে গিয়ে ব্লাড প্রেসার দেখে আসার মুহূর্তেই তো ডাক্তারবাবু ''কু-আপস' করে বসে আছেন। কাজেই শেষেও নিজেকে ভেঙে আর একটি কু-আপস করতেই হল। গুরুতর অসুস্থ হলে মেয়র, বিধায়ক যে কারও বাড়িতেই তিনি প্রেসার মাপতে যেতে পারেন—কিন্তু পাশের বস্তির ঠিকে ঝি-র স্বামী গুরুতর অসুস্থ হলে তিনি একই ভাবে প্রেসার যন্ত্র নিয়ে তার পাশে যান কি? চিকিৎসক জীবনে এই সাম্য যদি তিনি বজায় রাখেন, তা হলে অনেকটা লড়াই এমনিই জেতা হয়ে যায়।

ডায়াগনস্টিক সেন্টারের 'কাট মানি' না নিলে মাসিক আয় কিছু কমে, ক্রস-রেফারেন্স কিছু কমে ঠিক। কিন্তু ''অনুপস্থিত রোগীর হয়ে সতীপনা করে'' লাভ এটাই যে দালালগোষ্ঠীর লোকেরা ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলে কখনও বলতে সাহস পায় না— ''এ মাসে কেস একটু কম হয়েছে— আর একটু বাড়ান'' বা ''অমুক ওষুধটা আরও বেশি লিখতে হবে।'' আর ডাক্তারের নিজের মস্তিষ্ক ও নিজের কলমের স্বত্ব নিজের কাছেই থাকে।

একজন ডাক্তার যদি নিজের বিদ্যাটি ঠিকমতো জানেন, চিকিৎসাশাস্ত্রে যদি তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি থাকে এবং সৎভাবে রোগীর ওপর সে জ্ঞানের প্রয়োগ করেন—চিকিৎসক জীবনে তার স্বীকৃতি তিনি পাবেনই আর মোটামুটি স্বচ্ছল জীবনযাপনেও কোনও বাধা আসবে না—এ বিশ্বাস এখনও রাখি।

উচ্চ বিত্ত ও যশ চিকিৎসক জীবনে সব সময় হাত ধরাধরি করে আসে না। দু'টোর পথ কিছুটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। আমাদের ছাত্রজীবনেও 'রোল মডেল' হওয়ার মতো অনেক চিকিৎসক-অধ্যাপক ছিলেন—এখন বড় শহর-ভিত্তিক দামি কর্পোরেট ডাক্তার হওয়ার প্রবণতা চারি দিকে। কারণ শহরের বড়লোক রোগীদের চিকিৎসা করলে খুব ভাল প্রচারের আলোয় আসা যায়, আর আধা শহর, মফস্‌সল বা গ্রামের নিম্নবিত্ত রোগীর একই রোগ একই দক্ষতায় সারালেও তা কারও নজরে আসে না। কাজেই কর্পোরেট ভিকট্রি-স্ট্যান্ডে না পৌঁছতে পারলে ডাক্তারবাবুরা হীনমন্যতায় ভুগছেন। এক জন চিকিৎসকের প্রাথমিক কাজ যে রোগ সারানো—যশ, খ্যাতি, অর্থ উপরি পাওনা—সেটা আমরা সবাই ভুলতে বসেছি। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, বিজ্ঞানী রিচার্ড ফেইনম্যান এক বার তাঁর এক প্রাক্তন মেধাবী সহপাঠীর হতাশাগ্রস্ত চিঠির উত্তরে এই রকম লিখেছিলেন—তুমি যদি তোমার কোনও উৎসুক ছাত্রের প্রশ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পার, তোমার কোনও সহকর্মীর বিজ্ঞান কৌতূহল মেটাতে পার— সেখানেই জানবে তোমার জ্ঞানের সাফল্য।

চিকিৎসা-দক্ষতা ও আত্মপ্রত্যয় যথেষ্ট থাকলে আমাদের এখনও অতটা হতাশ হওয়ার সময় আসেনি—এই পত্রিকাতেই 'এক গাঁয়ের ডাক্তারের গল্প' তো আমাদের খানাখন্দ পেরিয়ে উত্তরণের পথ দেখিয়েছে।

সমস্ত ডাক্তারকুল শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞানকে পাথেয় করে সততার সঙ্গে জ্ঞানের প্রয়োগ করে আত্মতৃপ্তি পাওয়ার মতো আত্মশক্তি অর্জন করুন— চিকিৎসক দিবসে এই আশা রাখি।

বিনীত

ডা. শর্মিষ্ঠা দাস, দুর্গাপুর, ১লা জুলাই, ২০১৩।

চিঠির উত্তর

চিঠি লেখার জন্য পত্রলেখিকাকে ধন্যবাদ। একটি কল্পিত চরিত্রকে বাস্তবের ন্যায় ও আদর্শবোধের প্রেক্ষিতে অবমূল্যায়ন গল্পের মূল সুরের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। প্রতিপক্ষ হিসাবে প্রদীপ সরকার নিতান্তই দুর্বল। প্রদীপ সরকার বাস্তব চরিত্র নয়। মাঝখানে তাই লেখককে আসতেই হচ্ছে।

বাস্তবের না হলেও প্রদীপ সরকার কিন্তু বাস্তব-বিচ্যুত নয়। প্রদীপ

সরকারদের অস্তিত্ব নেই বলে যে চিকিৎসকেরা আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন সেটা তাঁদের অপ্রসারিত হওয়ার সমস্যা। তাঁরা নিজের বৃত্তেই থেকে যাচ্ছেন। স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ বৃত্তে তাঁদের পদচারণা নেই।

আমি ছাড়াও অন্য অনেকেই জানেন বহু ডাক্তারদের সকরুণ অধিষ্ঠান। ডাক্তারদের যে কয়টি শ্রেণি আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে নীচের তলার অধিবাসীরা হচ্ছেন যাঁরা খারাপ চাকরি করেন এবং যাঁরা খারাপ প্র্যাকটিস করেন। খারাপ চাকরি কী? যেমন প্রতিদিন হাজির হয়ে, চার ঘণ্টা উপস্থিত থেকে মাসে চার হাজার টাকা বা ক্লিনিক করে দিন পিছু ৭০০-৮০০ টাকা। খারাপ প্র্যাকটিস নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না।

স্বীকার করুন না করুন টাকা মানেই সম্মান। আপনি যদি টাকা দেখাতে না পারেন, বিলোতে না পারেন, সমাজে আপনার কদর শূন্য। এবং ব্যাপারটা ডাক্তারদের ক্ষেত্রেও সত্যি। অস্বচ্ছলতার সঙ্গে উপরি পাওনা—অবমাননা। ব্যাপারটা বুঝতে গেলে অবশ্য সম্মানবোধ থাকতে হবে।

পত্রলেখিকার মন্তব্য—'চিকিৎসক, শিক্ষক, অধ্যাপক, আধিকারিক সবাই এই দৌরাত্ম্যের শিকার'—হচ্ছে অবহেলার সাধারণীকরণ। যবে থেকে 'ক্রিমিলাইজেশন অব পলিটিক্স' শুরু হয়েছে, বিশেষত সত্তর দশকের পর থেকে, চিকিৎসকেরা হচ্ছেন 'সফ্‌ট্ টার্গেট'। তাঁদের দল নেই। তাঁরা একে অপরের সঙ্গে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করেন। চিকিৎসকেরা আইনজীবী নন যে একজনের ওপর অত্যাচার হলে রে রে করে তেড়ে আসবেন সবাই। শিক্ষক, অধ্যাপকদেরও দল আছে, আধিকারিকরা তো সরকারি চাকুরে। সরকার তাঁদের নিরাপত্তা দেয়। তাই পেশাগত কারণে একমাত্র ডাক্তারদেরই, তাও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নাম-গোত্রহীন জেনারেল ফিজিশিয়ানদেরই বাড়ি বা চেম্বার ভাঙচুর করা হয়।

'স্বাস্থ্যের বৃত্তে' প্রকাশিত 'একটি গ্রামের ডাক্তারের গল্প' তুলনা টেনে আনাটাও ঠিক নয়। এটি একজন চাকরি করা ডাক্তারের সাফল্য—এবং এটা গল্প হিসাবে লেখা হয়নি। উনি সকল প্রতিকূলতাকে জয় করে যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন বলে হেরো চরিত্ররা থাকবে না?

আর্থিক স্বচ্ছলতা বলতে আমি ঠিক কী বলতে চেয়েছি পত্রলেখিকা বুঝতে পারেননি। আমি সরকারের বেঁধে দেওয়া ন্যূনতম শ্রম-মূল্যের কথা নিশ্চয়ই বলতে চাইনি। সমযোগ্যতার একজন অন্য পেশার মানুষ যে রোজগার করেন, আমি সেটাই বোঝাতে চেয়েছি। আর মেয়রকে বাড়ি বয়ে ব্লাড প্রেসার দেখতে গিয়ে প্রদীপ সরকার আপস করেন বলে পাশের বস্তির মানুষকে দেখতে যান না—অনুল্লিখিত এই কথাটাকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করে প্রদীপ সরকারের মুন্ডচ্ছেদ করাটাও অন্যায়। আর যাঁরা পত্রলেখিকার চারপাশে ভিড় করে আছেন, বা বলা যায় যাঁদের সংখ্যাটা এতোই বেশি তাঁদের ভিড় এড়ানো খুব মুশকিল, তাঁদের অপকর্ম, যেমন ওষুধ কোম্পানির পয়সায় বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি—সেই অপরাধ অনেক বেশি। কেন না তাঁরা আপস করেন না, 'দুর্নীতি' করেন। পত্রলেখিকা তাঁদের সম্বন্ধে নীরব থাকলেন। এ কথাটাও না বললেই নয় যে গল্পের লেখক এবং গল্পের নায়ক একই অবস্থানে নেই। এমন দুরবস্থা লেখকের আজও হয়নি, ভবিষ্যতেও হয়তো হবে না। তবে বঞ্চনার মধ্যে পড়ে থাকা কোনও সঙ্গীর দুরবস্থা বর্ণনার অকপট (এবং হয় তো দুর্বল) প্রয়াস আপনাকে আঘাত করলেও আমি নাচার।

চিকিৎসক সম্বন্ধে একটা ধারণা চিকিৎসক, অচিকিৎসক সবার মধ্যে তৈরি হয়ে রয়েছে, একটা 'অগ্নীশ্বর' মার্কা মিথ, তাতে আঘাত লাগলে কেউ সহ্য করে না। অন্যভাবে খুব সফল হলে বলার কিছু নেই। তুমি পলাশ, সিধু ইত্যাদির মতো নামজাদা গায়ক হতে পারলে ডাক্তাররা তোমাকে নিয়ে গর্বিত হতেই পারেন। কিন্তু তুমি রাস্তার ধারে বাটি নিয়ে বসে থাকবে আর আমরা তোমাকে নিজেদের দলে রাখব সেটা সম্ভব!

ডাক্তার হতে গেলে কি আদর্শবাদী হতেই হবে? নিজে অসুস্থ অবস্থায় রোগীকে দেখতে যেতে হবে? নিজের পরিবারের কথা না ভেবে, ভবিষ্যতের কথা না ভেবে বিনা পয়সায় রোগী দেখতে কি ডাক্তাররা বাধ্য? ডাক্তার মানে কি সামাজিক ক্রীতদাস? ফল্‌স ছুটির সার্টিফিকেট দিতে হবে? মরে যাবার পর কারণ না-জেনে ডেথ সার্টিফিকেট দিতে হবে? স্কুটার চড়তে হবে, ফ্যাশনেবল টি শার্ট পরা চলবে না। তুমি ইচ্ছা হলে একদিন চেম্বার কামাই করে সিনেমা, থিয়েটার দেখতে যেতে পারবে না? রকে বসে আড্ডা দিতে পারবে না, চায়ের দোকানে বসে চা খেতে পারবে না? কবিতা লিখতে পারবে না, চেঁচিয়ে গান করতে পারবে না, না না না—চারপাশে ঘিরে আছে রক্ষণশীল নিও মর্ডান ইন্টেলেকচুয়ালস—তাঁরা কী করা উচিত বা কী উচিত নয় বলে গণ্ডি টেনে রেখেছেন। নিজের ধারণায় তাঁরা নিষ্ঠাবান, চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি রেখে গম্ভীর মুখে তাঁরা সঠিক জ্ঞানের প্রয়োগ করেন। তার বাইরে গেলে তুমি খেতে পাও বা না পাও, সম্মান পাও বা না পাও, নিজের মধ্যে থাকা আমিটাকে শান্তি দিতে পার বা না পার— সহানুভূতি পাবে না। মৌলবাদ?

পুনশ্চ : লেখাটির সাহিত্য হিসাবে মূল্যায়ন করা কি একেবারেই অসম্ভব ছিল? প্লেটে এক মুঠো কাঁকর সাজিয়ে দিলে সেটা খাওয়া যাবে না। কিন্তু সেটা খাবার নয় বলতেও তো আপত্তি হবার কথা নয়। কাঁকরকে খাবার বলে চালানোর দায়টা কিন্তু পরিবেশকদের — এ ক্ষেত্রে সম্পাদকমণ্ডলীর। লেখাটি বহু দিন ধরে সম্পাদকের কাছে পড়েই ছিল, দেরাজ খুলে, ধুলো ঝেড়ে এ লেখাটি প্রকাশের কি দরকার ছিল বুঝি না। সম্পাদকমণ্ডলী নীরব কেন?

—'প্রদীপ সরকার, এম বি বি এস' গল্পের লেখক।

নানা কারণে লেখাটি প্রকাশ করা হয়েছে অনেকদিন পরে, কিন্তু সেটার জন্য তার সাহিত্যমূল্য নেই — সম্পাদকমণ্ডলী এমন ভাবেন না। কে কীভাবে লেখার সমালোচনা করবেন সেটা আগেই বুঝে লেখা প্রকাশের সময় নির্ধারণ করা সম্পাদকের পক্ষে অসম্ভব, সেটা আশা করি লেখক বুঝবেন। সম্পাদক,স্বাস্থ্যের বৃত্তে।

With Best Compliments from :

UNICHEM

With Best Compliments from :

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

ORTUS DIVISION

With Best Compliments from :

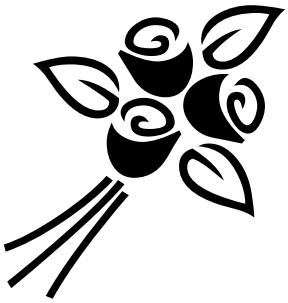

SHINE PHARMACEUTICALS LTD

P-77, KALINDI HOUSING ESTATE

KOLKATA - 700089